মহাপীঠের অমৃতপথে

অমিত ভট্টাচার্য্য

মহাপীঠের অমৃতপথে

(২০১৫ এবং ২০১৭ সালে শ্রীগুরুদেব শ্রীতারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও
শ্রীশ্রীবিপুল বাবার আশীর্বাদ নিয়ে তাঁদের চরণাশ্রিত এক দাসের তারাপীঠ ও
মা তারার দর্শনের এক ছোট্ট অভিজ্ঞতা)

অমিত ভট্টাচার্য্য

জয় মা তারা পাবলিশার্স

২৫৫/২, যোধপুর পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৬৮

প্রথম প্রকাশ: জগদ্ধাত্রী পুজো, ২০১৭

জয় মা তারা পাবলিশার্স
২৫৫/২, যোধপুর পার্ক,
কলকাতা- ৭০০০৬৮
Email: jaymatarapublishers@gmail.com

© **শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক**
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

বর্ণ সংস্থাপনঃ
শ্রী অনুপ কুমার খাঁ

মুদ্রণঃ
সেঞ্চুরী প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ - শ্রী বন্ধন রায়
PDF - শ্রী নবারুণ রায়

ব্যবস্থাপনাঃ শরণাগত সম্প্রদায়

শরণাগত সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা-

Website: www.sharanagotosomproday.co.in
Email: sharanagoto.somproday@gmail.com

Facebook page :

https://www.facebook.com/SharanagotoSomproday

ISBN No: -978-93-82325-98-4

মূল্য- ৩০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীবিপুলবাবার শ্রীচরণে এই রচনা উৎসর্গ করা হল।
মা তারা শ্রীশ্রীবাবাকে সুস্থ নীরোগ রাখুন ।
শ্রীশ্রীবাবা সুস্থদেহে জগৎকল্যাণে ব্যপৃত থাকুন।
আসন্ন মহাতারাযুগের সূচনায় আমরা শ্রীশ্রীবাবার
পথনির্দেশে যেন এই ভাবেই এগিয়ে চলতে পারি।

জয় জয় তারা জয় জয় বাম।

---ইতি
লেখক

তারা মা

এক

“আমার মা ত্বংহি তারা”

তারাপীঠ নামটা শুনলেই কেমন একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত শিরশিরানি অনুভূত হয়, তাই না? বিশেষ করে ঐ মহাশ্মশান!!! কিন্তু আমার তেমন কিছুই মনে হত না দুর্ভাগ্যজনক ভাবে। কারণ আমার জন্ম থেকে স্কুল জীবন পর্যন্ত বীরভূমেই কেটেছে। আমার বাড়ি থেকে তারাপীঠ ৩৩ কিমি দূরে। তাই তারাপীঠ সম্পর্কে আলাদা কোন অনুভূতি তৈরীই হয় নি। শুধু মনে হত কলকাতা থেকে কিছু লোক গিয়ে তারাপীঠ আর মা তারাকে নিয়ে বড্ড মাতামাতি করে। ছোটবেলা থেকে মেরেকেটে ৩ বার তারাপীঠ গেছি। তাও মাত্র ২-৩ ঘন্টার জন্য। আসলে আমাদের আদি বাড়ি তো উত্তর কলকাতায়। সেইসূত্রে ২-১ বার কালীঘাটে যাওয়া হয়েছিল। আর ওখানে পান্ডাকূলের যে দৌরাত্ম্য দেখেছি, তারাপীঠেও এসে মোটামুটি কাছাকাছি কিছু দেখার ফলে জায়গার সঙ্গে ভালোবাসা দূরে থাক, উল্টে দূরত্বই বেশি তৈরী হয়েছিল।

ধারণাটা বদলাতে শুরু করল ২০১৩ থেকে, শ্রীশ্রীবিপুল বাবার “মহাপীঠ তারাপীঠ” পাঠ করবার পর। “মহাপীঠ তারাপীঠ” য়ের ১ম খন্ডের তারাতত্ত্ব পড়তেই আমার সবচেয়ে

বেশি সময় লেগেছিল। কমবেশি সকলেরই একই রকম অভিজ্ঞতা, যে “কি পড়লাম!! কি অপূর্ব!”

বীরভূমে বাড়ি হওয়ার একটা অসুবিধাও ছিল। শ্রীশ্রীবিপুলবাবা বলেন, যে কোন সিদ্ধ তীর্থস্থানে তীর্থদেবতার কৃপা লাভ করতে হলে কমপক্ষে তিনরাত্রি কাটানো উচিৎ। তো এতকাছে বাড়ি হওয়ায় কেউ ভাবতেই পারে না রাত কাটানোর কথা। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রায় বেশিরভাগ কলকাতা বাসীর মতো আমার বাবাও খুব তারা মায়ের ভক্ত ছিলেন। কেউ বাবাকে “জয় নিতাই” বলে সম্বোধন করলেই বাবা তাকে “জয় তারা” বলে খুব জোরে হাঁক দিত, আর সেই ব্যক্তি ঘাবড়ে যেত। আর ছোট্ট অবস্থায় আমরা খুব মজা পেতাম।

দুই

২০১৭ তে পুজোয় তারাপীঠ যাই। এবার গিয়ে খুব বেশি করে ২০১৫ সালের পুজোর কথা মনে পড়ছিল। সেবার শ্রীশ্রীবাবার অনুমতি নিয়ে তারাপীঠ গেছিলাম। তিনরাত্রি তো অবশ্যই থাকবো। বেনফিসের গেস্ট হাউস রক্তজবায় বুকিং ছিল। কলকাতা থেকেই বুকিং করে রেখেছি। যাব কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে শিয়ালদা থেকে। কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ট্রেন বেশ লেট করে। পৌঁছালোও অনেক দেরীতে। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে শেয়ারের ম্যাক্সি গাড়ীতে চেপে বসলাম

তারাপীঠের উদ্দেশ্যে, মনে পড়ে যাচ্ছে রবি ঠাকুরের একটি কবিতা~~

“বহুদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।।”

পোঁছালাম গেস্ট হাউসে। পান্ডাকে ফোন করাই ছিল। বিকেলে এসে কথা বলে গেলেন। ভদ্র, অমায়িক। এখানে একটা কথা বলি, “জীবন থেকে মহাজীবনের পথে-১” এ দাদা যে তারাপীঠের বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের তারাপীঠের প্রায় কোনই মিল নেই বহিরঙ্গে। রামপুরহাট থেকে আসবার সময় কিছু ধানক্ষেত অবশ্যই দেখেছি। কিন্তু তারাপীঠে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া। কথা হয়ে গেল, পরদিন অর্থাৎ সপ্তমী তিথিতে আমরা তারা মন্দিরে মা তারাকে পুজো দিতে যাবো এবং শিমূলতলায় পাদপদ্মেও পুজো করাবো। এছাড়া গতিও নেই। কারণ ষষ্ঠী বা অষ্টমী তিথিতে আমার মায়ের উপোস থাকে, তাই মা তারার অন্নভোগ গ্রহণে অসুবিধা। তাই কাল সপ্তমীতেই পুজো।

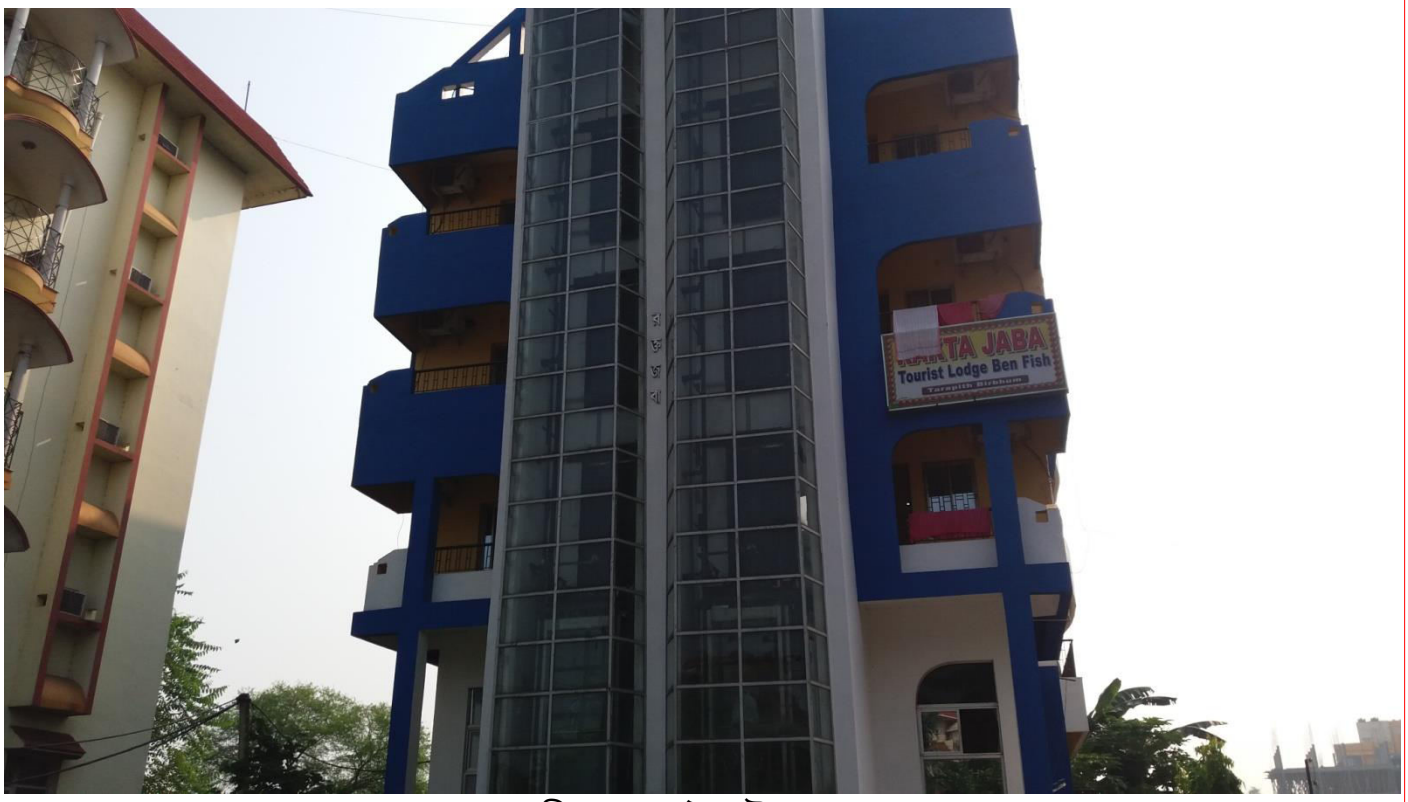

বেনফিসের গেস্ট হাউস রক্তজবা

তিন

ভোরের তারাপীঠ। গেস্ট হাউসের ব্যালকনি থেকে ধূধূপ্রান্তর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ কাশফুলে ছেয়ে আছে। আর তার গা জড়িয়ে রয়েছে ভোরের ঠান্ডা কুয়াশা। আমি বরাবর খুব ভোরে উঠি। মা ছোটবেলা থেকেই এই অনুশাসন বজায় রেখেছেন। তাই এমন সুন্দর দৃশ্যে মনটা ভালো হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল শ্রীশ্রীবাবার কথা, “তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের মা তোমায় কত ভালোবাসেন। তাহলে যিনি জন্মজন্মান্তরের, চিরকালের চির আপন মা, সেই রাজরাজেশ্বরী মা তারা তোমাদের কতই না ভালোবাসেন।” তারই এক ঝলক মা যেন আগাম পাঠালেন তাঁর অজ্ঞানী সন্তানদের উদ্দেশ্যে।

তারপীঠের গেট

সূর্য পুবদিগন্তে উদিত হওয়ার পূর্বেই আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের পান্ডাজীর কাছে। উনি আমাদের সব বুঝিয়ে দেওয়ার পর আমরা গেলাম জীবিত কুন্ডে স্নান সারতে। সম্ভবতঃ পূর্ব দিকের ঘাটে, যেখানে জয়দত্ত বণিকের মৃত পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মা তারা, সেই ঘাটেই আমরা স্নানে নামলাম। ওখানে জয়দত্ত বণিক এবং তার মৃতপুত্রের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে বর্তমানে। ঘাটটি যথেষ্ট শ্যাওলা পূর্ণ। বহুদিন যাবৎ কেউ স্নানে নামেনি সেটা বোঝাই যাচ্ছে। যাই হোক, খুব সাবধানে নেমে স্নান সারলাম সেই পবিত্র জীবিতকুন্ডে। ‘অমৃতমে’ শ্রীশ্রীবাবা একবার লিখেছিলেন, সম্ভবতঃ ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে কোন এক বক্তৃতাসভায় শ্রীশ্রীবাবা তারাতত্ত্বের উপর ভাষণ দিয়েছিলেন এবং সেখানে

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ১০,০০০ ছোট্ট শিশিতে এই জীবিতকুন্ডের জল বিতরণ করা হয়েছিল।

জীবিত কুণ্ড

এরপর শুরু হল লাইনের পালা। বিরাট কিউ। পান্ডাজীর ভাইপো ভিআইপি লাইনে দাঁড় করাতে চান, জন প্রতি ৩০০। অনেক বলে কয়ে একটু কমে রাজি করানো গেল। লাইন ঘুরে ঘুরে বিরামখানার পাশ দিয়ে চলে গেছে সোজা মূল ফটকের কাছে। এই বিরামখানায় মা তারা বছরে বেশকিছুদিন অবস্থান করেন, তারাপূজার সময়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। মাতা সতী যে দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করেছিলেন, সেই কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা,

মাতঙ্গী ও কমলা-- এর মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা বলেন দুটি মহাবিদ্যা, কালী ও তারা, দেবীর বাকি রূপগুলি শুধু বিদ্যা। কালী কৈবল্যদায়িনী, ডান পা মহাদেবের বুকের উপর এবং মুন্ডমালা পরিহিতা। অপরদিকে তারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী, বাম পা মহাদেবের উপর এবং গলায় করোটির মালা, সর্প আভূষণে বেষ্টিতা। কালীপূজা দ্বীপান্বিতা অমাবস্যায় হয় আর তারা পূজা মাতারার আবির্ভাব তিথিতে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীর তিথিতে হয়। কিন্তু বর্তমান টিভি চ্যানেলগুলির দৌলতে মাতারার মন্দিরও আসলে "আরেকটা কালীমন্দিরে" পরিনত হয়েছে। শুক্লাচতুর্দশীর নাম এরা কেউ শোনেনি। যত লাইভ টেলিকাস্ট হয় সব দ্বীপান্বিতা অমাবস্যায়।

চার

মূলফটকের মুখেই এসে পড়েছি। যেভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে মা তারাকে এতকাল দেখে এসেছি, তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে মায়ের দর্শনে যাচ্ছি। "মহাপীঠ তারাপীঠ" পাঁচখন্ড পাঠ সম্পূর্ণ অনেকদিন আগেই। সেইসব মনে পড়ে যাচ্ছে সত্যযুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক যুগে তারাপীঠ তথা তারামন্দিরের বিবর্তনের ইতিহাস। শ্রীশ্রীবামের সুবিশাল দিব্য জীবন কথা। ভাবনায় ছেদ পড়ল। "দাদা এই হল মায়ের চরণ, এই লেন আলতা। মায়ের চরণে লিবেদন করেন। দকখিনা দেন। উঁহু, খুচরো পয়সার কি দিন আছে গো! কোলকেতার বাবু, টাকা দ্যান। " অগত্যা প্রত্যেকে মন্দিরে

ঢোকার পূর্বে একটা থালায় রাখা পেতলের পাদপদ্মে আলতা ঢেলে ১০ টাকা মাথা পিছু দক্ষিণা দিয়ে খালাস। পান্ডাজীর ভাইপো বলল, কিছু করার নেই। ওটা লাগবেই।

একটা থালায় রাখা মায়ের পেতলের পাদপদ্ম

আচ্ছা, তার আগে মন্দিরের একটু বর্ণনা দিই। শ্বেতপাথরের তৈরী বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। পাশেই জুতো ঘর। মন্দিরে ঢুকেই বাঁদিকে যজ্ঞশালা, বিষ্ণু মন্দির, হনুমান মন্দির ও বামদেবের মন্দির। আরও বামদিকে গেলেই জীবিতকুন্ডের ঘাট। সোজা এগোলে মা তারার ভৈরব, চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির। আর ডানদিকে মায়ের শ্বেতপাথরের নাটমন্দির। তারপরেই মায়ের মূলমন্দির। মূলতঃ সামনের দিকটা টেরাকোটার কাজ। আর বাকি তিনদিক সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো। রুপোর নির্মিত মূলফটক পেরিয়ে প্রবেশ করলাম গর্ভগৃহে। এই সেই স্থান

যেখানে পরমপবিত্র তারাশিলা বর্তমান। সেই সত্যযুগে মাতা সতীর তৃতীয়নেত্র এখানে পতিত হয়েছে। যদিও এসম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণা বর্তমান। তারাপীঠ নাকি সতীপীঠ নয়। সিদ্ধপীঠ মাত্র। ৫১ সতীপীঠের আওতায় আসে না। সাপ্তাহিক বর্তমানেও তাই বেরিয়েছিল। এখানে বলে রাখি, আমি পীঠমালা, আগমনিগম তন্ত্র, শাল্মলীদহনতন্ত্র কিছুই পড়িনি। শুধু "মহাপীঠ তারাপীঠ" পড়েছি। আর মহাপীঠ তারাপীঠে শ্রীশ্রী বিপুলবাবা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সতীপীঠ আসলে ৫১ নয়, ১০৮ টি। আর তারমধ্যে তারাপীঠ অন্যতম। যদিও উদ্বোধন পত্রিকা এজন্য বাবার কঠোর সমালোচনা করেছে এবং ১০৮ সতীপীঠ বাবার অলীক কল্পনা এমনও বলেছে। আমার কাছে শ্রীশ্রীবাবার কথাই বেদবাক্য আর আমরা তাই মান্য করি। যাই হোক ঢুকলাম গর্ভগৃহে।

তারাপীঠ নাট মন্দির

চন্দ্রচূড় মন্দির

পাঁচ

ছোট্টবেলায় এসেছি। ভালো করে দেখিওনি। এখন দেখব, তাই তো ঢুকছি। “জয় তারা” হাঁক দিয়ে ঢুকলাম। ছোট্ট গর্ভগৃহ। তারমধ্যে আবার চাপাচাপি ভিড়। আমাদের তিনজনের হাতে তিনটি বস্তু। ডালা, রক্তজবার গোড়ে মালা আর মায়ের জন্য নিয়ে আসা একখানা

লাল শাড়ী। আমার হাতে রয়েছে মা'কে নিবেদন করবার জন্য নীল অপরাজিতার লম্বা গোড়ে মালা। ভিড় 'ইউ' এর মতো ঘুরে মা'য়ের বেদীর দিকে চলেছে। সাথে পান্ডাজীর ভাইপো। মোটামুটি গর্ভগৃহে ঢোকার আগেই লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা চলাকালীন সকলেরই পুষ্পাঞ্জলী হয়ে যায়,যাতে গর্ভগৃহে বেশি ভিড় না হয়। আমাদেরও তাই হয়েছে। এখন শুধু দর্শন।

আমার মা লাল শাড়ী পড়েন না। কিন্তু যদি পড়তেন, তবে নিজের মা'কে ঠিক যেমন শাড়ী দেওয়া উচিৎ তেমনি, খুব দামী না হলেও, সুন্দর নরম আর একদম নতুন ডিজাইনের একটা শাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম নিজে পচ্ছন্দ করে। কয়েকজন হিতৈষী বলেছিলেন, "আরে এসব লাক্সারি করবার কি দরকার? মা'তো কতই পড়বে। যাবে তো পুরোহিতের ঘরে। লাল পাড় সাদা শাড়ী দেবে কোথায়, তা নয়!" নাহ, শুনিনি। কারোর কথাই শুনিনি।

সামনে এক দীর্ঘদেহী চর্বিবহুল লোমশ পানাসক্ত (দেখে মনে হল) ব্যক্তি, যার দুই হাতের ১০ টার মধ্যে ৯টা আঙুলেই সোনার আংটি আর গলায় বাপ্পীদার মতো দু-তিনটে মোটা সোনার চেন, এইরূপ এক ভদ্রলোক, দুই হাত দিয়ে মা তারার মূর্তিকে চেপে ধরেছেন, "মা, মা, মা'গো, দয়া কর মা, দয়া কর ছেলের উপর"। আধ্যাত্মিক দয়া চাইছেন না বলেই প্রতীত হচ্ছে। আর জাগতিক দয়ায় মা কোন খামতি রেখেছেন বলে তো মনে হয় না। যাই হোক, কি জানি কি দয়া!!!

স্টিলের ব্যারিকেড দেওয়া বেদীর চারপাশে। একটা ছোট্ট দরজা আছে অতিকায়দের জন্য। আমাদের বলল, ব্যারিকেডের নিচে মাথা গলিয়ে শরীরটাকে চালান করে দিয়ে ঢুকতে। ঢুকে পড়লাম। নীল অপরাজিতার মালা নিজে হাতে মাকে পরালাম। পুষ্পাঞ্জলীর পদ্মটাও নিচু হয়ে মায়ের পদপ্রান্তে চরণ স্পর্শ করে নিবেদন করলাম। আমার মাও মালা দিলেন। তারপর মায়ের অপার করুণায় পান্ডাজীর ভাইপো মাকে বললেন শাড়ীটা মা তারার মুকুটের উপর দিয়ে দুই কাঁধে জড়িয়ে দিতে। আমার মা সানন্দে তাই করলেন। বেরিয়ে এলাম ব্যারিকেড থেকে। গর্ভগৃহের এককোণে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলাম ত্রিলোকজননী নীলসরস্বতী মা তারার বিগ্রহকে। কি অপরূপ স্নিগ্ধতা। মায়ের মুখমন্ডল থেকে অপূর্ব স্নেহবারি যেন সিঞ্চিত হচ্ছে উপস্থিত সকলের মধ্যে। মা তারাকে অপূর্ব গোলাপী রঙের বেনারসী পড়ানো হয়েছে। সাথে মানানসই চেলি। ফুলের মুকুটও পড়ানো হয়েছে রৌপ্যকিরিটের উপর। স্বর্ণময় লম্বা নথ, গলায় সোনার হার। আর তৃতীয় নয়নটি যেন জাজ্বল্যমান, ঠিক ঐ গানটার মতো, “আছো সর্বঘটে, অর্ঘ্যপুটে”, “সাকারা আর নিরাকারা”।

নাহ্ মহিলা সিকিউরিটি বড্ড তাড়া দিচ্ছে। গর্ভগৃহ থেকে বের করে দিয়েই খুশি হতে চাইছে, “অতক্ষণ যে দাঁড়াতে দিলাম”। বটেই তো। সব কিছুরই তো একটা মূল্য আছে। অগত্যা খুশি করতে হল।

ছয়

বেরিয়ে এসে সকল পার্শ্বদেবতার মন্দির দর্শন করলাম। আর মা'য়ের ভৈরব চন্দ্রচূড় শিব মন্দিরেও পুজো দিলাম, ১০৮ বেলপাতার মালা, আকন্দ মালা, ধুতুরা দিয়ে, যা মন্দির চত্বরেই কয়েকজন বিক্রি করছেন। ভিতরে মহাদেব বিরাজ করছেন। ধূসর বর্ণের লিঙ্গ, গৌরীপট্ট গর্ভগৃহের মেঝেতেই নির্মিত। পাশে পুরোহিত রয়েছেন। কিন্তু কোন জোর জুলুম নেই। আপনি নিজেও পুজো করতে পারেন। পুরোহিতের সাহায্য নিয়েও করতে পারেন। মহাদেব আশুতোষ, অল্পেই সন্তুষ্ট। পাশেই ঘটি আছে। বালতিতে দুধ আর গাঁজার শুকনো পাতা সিদ্ধি এই সবের মিশ্রণ। এক ঘটি করে ঐ মিশ্রণ প্রত্যেকে নিয়ে প্রাণ ভরে চন্দ্রচূড় শিবের অভিষেক করলাম।

"নাগেন্দ্র হারায়, ত্রিলোচনায়, ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়"।

মনে পড়ে গেল শ্রীশ্রীবিপুলবাবার অমৃতময় স্মৃতিচারণ, "সেবার তারা মন্দিরে ভান্ডারা দেওয়া হচ্ছে। আমি বসে রয়েছি চন্দ্রচূড় শিব মন্দিরের ভিতরে। হঠাৎ মা এলেন, সাথে চন্দ্রচূড় মহাদেবও। আমার সাথে প্রায় অনেকক্ষণ কথা বললেন, ঠিক যেমন মা তাঁর নিজের সন্তানের সঙ্গে কথা বলেন। মা তারা তাঁর ভৈরব চন্দ্রচূড় মহাদেবের সঙ্গে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ খুনসুটি হয়, তেমন খুনসুটিও করছিলেন। আর অট্টহাসিতে চারদিক ফেটে পড়ল। অথচ বাইরে সবই

স্বাভাবিক। কেউ কিছু বুঝল না। যেমন ভান্ডারা চলছিল তেমনই চলল।” দেবদুর্লভ অভিজ্ঞতা!

একটি দেহাতি মহিলা এসে চন্দ্রচূড় মহাদেবের পিছনের কুলুঙ্গিতে রাখা পঞ্চমুখী শঙ্খে আলতা জাতীয় পদার্থ ঢেলে বেশ করে নমো করে চলে গেল। তাই দেখে আমার মাও এগোলো শঙ্খটিকে নমো করতে। যত ইশারায় বারণ করছি, দেখলে তবে তো! শেষে প্রণাম সাঙ্গ করে বেরোতে গিয়ে দেখে শাড়ীর সামনেটায় ঐ আলতা লেগে অনেকটা ছাপ ফেলে পুণ্য প্রদান করে দিয়ে গেছে।

তারপর ধূপ মোমবাতি জ্বেলে মা তারা, চন্দ্রচূড়, নারায়ণ, হনুমানজী ও বামদেবকে আরতি করে জীবিতকুন্ডের ঘাটে অবস্থিত কল্কি ভগবানের মূর্তির সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় সেই ধূপ-দীপ রেখে তারা মন্দির থেকে বেরোলাম পান্ডাজীর দোকানের দিকে।

সাত

দোকানে গিয়ে ওরা প্রসাদ ফুল সব বেঁধে-ছেদে তৈরী করে দিল। তারপর নতুন ডালা রেডি করল পাদপদ্মে পুজোর জন্য। শ্রীশ্রীবাবা আমাদের আসবার আগে বলেছিলেন পাদপদ্মে পুজোটা খুব ভালো করে দিতে। এটাই মা তারার মূল পুজো। ডালাতে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা এগোলাম। সঙ্গে নীল অপরাজিতা, হলুদ কলকে আর লাল জবা দিয়ে তৈরী অপূর্ব দর্শন একটা মালা কিনে নিলাম।

আর তিনজনের তিনটে পদ্ম। উত্তর দিকে এগিয়ে তারাপীঠ মহাশ্মশানে প্রবেশ করলাম।

আগেও এসেছি। কিন্তু তখন তো ভালো বুঝিনি। শ্মশানে প্রবেশ করে বেশ কয়েকধাপ পাকা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ডান দিকেই মা তারার আদি অকৃত্রিম পাদপদ্ম। ছোট্ট মন্দিরের মতো করে আচ্ছাদন দেওয়া। দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলেও, এমনকি তারা মন্দিরের আমূল সংস্কার হলেও মায়ের পাদপদ্ম কিন্তু একই রকম থাকবে।

এখানেও লাইন। একে একে এগিয়ে গিয়ে দেখি সামনে ষ্টিলের ব্যারিকেড। পাশেই এক বুড়ি বসে ডান্ডা হাতে। ওনার হাতে জন প্রতি ১০ টাকা নজরানা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি মিলল। এই সেই পাদপদ্ম, যেখানে সত্যযুগে বশিষ্টদেব মা তারার চরণ দর্শন পেয়েছিলেন। এখানেই রয়েছে মায়ের প্রস্তরীভূত চরণযুগল। এখানেই কোথাও নাকি ছিল সেই বিখ্যাত শ্বেতশিমূল বৃক্ষ। যা শিমূলতলা নামে পরিচিত ছিল। বলা হয়, বামদেবের জন্মের বহুপূর্বেই শাল্মলীদহন তন্ত্র রচিত হয়। এবং সেখানে লেখা ছিল, যিনি এই পরম পবিত্র শ্বেতশিমূলবৃক্ষ দহন করবেন তিনিই হলেন কুলনাথের নাথ দ্বিতীয় ভৈরব অর্থাৎ স্বয়ং বামদেব।

পাদপদ্ম – মায়ের প্রস্তরীভূত চরণযুগল

একটু নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কুঠুরির ভিতর ঢুকতে হয়। একটা মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। আমাদের পান্ডাজীর ভাইপো একে একে সিঁদুর, জবা কুসুম তেল, সুগন্ধী গোলাপ জল ঢেলে দিতে বললেন। তারপর একটি নতুন গামছা দিয়ে মায়ের পাদপদ্ম ভালো করে মুছিয়ে দিতে বললেন। শেষে আলতা ঢেলে মায়ের দুই পা রাঙা করে, মালাটি পাদপদ্মকে ঘিরে অর্পণ করে পদ্মফুল দিয়ে সাজিয়ে আমরা ডানপাশের ছোট্ট গেট দিয়ে বেরোলাম। তারপর ধূপ মোমবাতি দিয়ে বাইরে থেকে আরতি সারলাম। পান্ডাজীর ভাইপো বললেন, “এই গামছাটা সযত্নে রেখে দেবেন বাড়ীতে। মা তারার আশীর্বাদ।”

আট

পাদপদ্ম মন্দিরের ঠিক ডান পাশেই শ্রীশ্রীবামদেবের সমাধি মন্দির। তার ডানপাশে শ্রীশ্রীবামের গুরুপ্রতীম মোক্ষদানন্দের সমাধি। পাদপদ্ম মন্দিরের ঠিক পিছনেই ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূতের সমাধি। ওখানে অনেকেই বলেন, ইনিই নাকি শ্রীশ্রীবামের মানসপুত্র। শ্রীশ্রীবামদেবের সমাধিতে এবং বাকি সমাধিগুলিতে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে গেলাম পাদপদ্ম থেকে বামদিকে শ্মশানের ভিতর। চারদিকে বড় বড় নিম অশ্বত্থ বেলআর ইউক্যালিপটাস এর গাছ। তবে কেথায় সেই "মহাপীঠ তারাপীঠ" বর্ণিত মহাশ্মশান? এ যে তার ভগ্নাংশ মাত্রও নয়! বোধকরি দ্বারকা নদী আরও পূর্বদিকে সরে এসেছে, তারফলে শ্মশান আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। গাছ গুলিও তেমন ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, অনেক ফাঁকা ফাঁকা। ভিতর দিয়ে সরু পাকা রাস্তা। একফালি রাস্তা চলে গেছে পবিত্র দ্বারকা নদীর দিকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে উত্তরবাহিনী দ্বারকার জল মাথায় ছিটিয়ে নিলাম। তারপর এগোতে যাব, এক কালো কুচকুচে মহিলা, লাল বস্ত্র পরিহিতা, একরাশ কালো চুল, রক্তবর্ণ চক্ষু, হাত বাড়িয়ে বললেন, "মা কে কিছু দিবি না বাপ?" ওনাকে সামান্য চা জল পানের মতো সাহায্য করে ফিরে আসছি। বামপাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি। বর্তমানে ২০১৭ তে গিয়ে দেখি তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ সেই ফাঁকা জায়গায় সারদিয়ে প্রায় ১০টা টিনের ছাদের পাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছে সাধক সাধিকাদের জন্য। অনেকটা এইরকম লেখা, ব্লক-১, রাঙা বাবা,

ব্লক-২, বড় যোগী বাবা, ব্লক-৩, ভৈরবী মা~~~ এইরকম । এতে হয়ত সাধকদের বেশ কিছুটা সুরাহা হল, কিন্তু শ্মশানের নিস্তব্ধতা, নির্জনতা অনেকটাই ভঙ্গ হল। সেই সন্ন্যাসীর গল্পটা মনে পড়ছে, যে গরু পুষতে শুরু করেছিল।

যাই হোক ২০১৫ তে ফিরি আবার। ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোতেই চোখে পড়ল শিবাভোগতলা।

শিবাভোগতলা

আমাদের শ্রীশ্রীবিপুল বাবার সাধনস্থলী। আমাদের প্রত্যেকের পূজনীয় স্থান। শান বাঁধানো। উপরে টাইলস্ দিয়ে বেদী মতন করা আছে। তাতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র লেখা। বেদির উপর একটি বিরাট বৃক্ষ। বেশ একটা গা ছমছমে পরিবেশ। নিকটেই একটি তুলসী

বেদি। আমরা প্রণাম জানালাম এই সিদ্ধস্থানকে। কিন্তু বসবার মতো সাহস হল না। কারণ আশেপাশে প্রচুর তান্ত্রিক আর ভৈরবী ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। এগিয়ে গেলাম। দেখি ডানপাশে টিনের ঘেরাটোপে একটি শবদেহে অগ্নি সংস্কার হচ্ছে। শ্মশানের ভিতেরই একটি হোটেল তৈরী হয়েছে, ঐ দেবরাজ হোটেল না কি যেন নাম। উফ্! মৃতদেহের জন্য ১০'/১০' জায়গা মাত্র। বাদবাকি জায়গায় খাওয়া দাওয়া, আবাসগৃহ, সমাধি মন্দির, হোটেল। তারাপীঠ মহাশ্মশান এখন অতীতের জলছবি মাত্র। মহাপীঠ তারাপীঠ-৫ এ শ্রীশ্রীবাবা বলেছেন, যেদিন মা তারা মনে করবেন তারাপীঠ মহাশ্মশানের সেই প্রচীন ঐতিহ্য পবিত্রতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, সেই দিনই এই সব আধুনিকতা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। আবার প্রকট হবে শ্মশান বিভীষিকা। কালোর মাঝেই প্রকট হবে জগতের আলো।

দ্বারকা নদী

তারাপীঠ মহাশ্মশান

নয়

তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে বেরিয়ে আমরা ফিরে গেলাম পান্ডাজীর দোকানে। সেখানে সব দক্ষিণা মিটিয়ে দিয়ে প্রসাদ ফুল সব ঝোলায় নিয়ে নিলাম। আমাদের পান্ডাজী আমাদের জন্য মা তারার মহাপ্রসাদ অন্নভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ততক্ষণে সূর্য মধ্যগগন ছাড়িয়ে পশ্চিমের পথে। সেই প্রসাদের পরিমাণ এত যে প্রসাদের বালতি গামলা সহ আমাদের গেস্ট হাউসে পৌঁছানোর জন্য রিক্সা করতে হল।

মা তারার মহাপ্রসাদ এসেছে তারা মন্দির থেকে। “জয় তারা”। প্রসাদের পদগুলির মধ্যে আছে পুষ্পান্ন বা ঘি-ভাত (কেশর দেওয়া), গোল গোল আলুভাজা, পটল ভাজা, বেগুণ ভাজা, মাছ ভাজা, আলু

পটলের ঝোল, আলু কুমড়োর সব্জি, দুধের পায়েস আর টমেটোর চাটনী এবং রসগোল্লা। আমরা পরিমাণ মত নেওয়ার পরও অনেকটা রয়ে গেল। তখন গেস্ট হাউসের হাউস কিপিং স্টাফ মাসিকে ডেকে মায়ের বাকি ভোগ প্রদান করলাম আর গামলা বালতি গুলো সাফ করে দিতে বললাম। আবার ফেরত দিতে হবে।
মায়ের অন্নপ্রসাদ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে মায়ের কৃপার পরশ অনুভব করলাম। শ্রীশ্রীবাবা বলেন প্রসাদ রক্তকে শুদ্ধ করে। দেহ মনে দিব্য ভাবের উদয় ঘটায়। তাই প্রসাদ সর্বদাই সর্ব অবস্থায় গ্রহণীয় ও বাঞ্ছনীয়।

মা তারার ভোগ

দশ

বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পরলাম । আমাদের গেস্ট হাউসটা দ্বারকা নদী পেরিয়ে রামপুরহাট রোডের উপর। তারাপীঠের বাঁধানো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলেছি বামদেবের পূজার লক্ষ্যে। এখানে একটা বিষয় বলবার আছে। তারাপীঠে কিন্তু অনেকগুলো বামদেবের মন্দির। তারামন্দিরের প্রাঙ্গণেই একটি। মন্দির থেকে বেরিয়েই উত্তর দিকে যেতে গেলে বিরাট বামা নিকেতনের সুদৃশ্য বামদেবের মন্দির। বামদেবের মূর্তিটিও ভারী চমৎকার। তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলে বামদেব সংঘ পরিচালিত আরেকটি বামদেবের মন্দির। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তবে আমরা পুজো দেব শ্রীশ্রীবামদেব প্রতিষ্ঠিত মূল আশ্রমে। পূজনীয় শ্রীশ্রীবাবা বলেই দিয়েছিলেন আশ্রমের কথা। মহাশ্মশানের প্রবেশদ্বার পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেই ডানদিকে রাস্তার উপর “বামা মিশন”। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সামনে গ্রীল দেওয়া বারান্দা ও গর্ভগৃহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে কোন প্রবেশ পথ নেই। পাশেই একটি গ্রীলের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। প্রবেশ করে দেখি পুরোহিত মশায় প্রস্তুতি সারছেন। তাকে গিয়ে বললাম আমাদের অভিপ্রায়। আসলে সচরাচর বাইরের ভক্তরা খুব একটা এইসব মন্দিরগুলিতে পুজোর জন্য আসে না। সমস্যা একটাই। বামদেবের পূজায় কারন বারি আবশ্যিক। মা’কে ওখানে বসিয়ে আমরা দৌড়লাম সেটির খোঁজে। হাঃহাঃ, আসলে অভ্যেস নেই তো। সোজা দক্ষিণদিকে রাস্তা বরাবর

চলে গিয়ে তিনমাথার মোড়ে এক টিনের ছাউনি দেওয়া মিষ্টির দোকানে পাওয়া গেল। একটি কাগজে মুড়ে সেটি হস্তগত করলাম।

শ্রীশ্রীবামদেব তাঁর জীবদ্দশায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপীঠ তারাপীঠে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে তাঁর তিরোধানের পর এই খড়ের আটচালা আশ্রমটি পাকা করা হয় এবং বামা মিশন প্রতিষ্ঠা করে এর দেখভালের বন্দোবস্ত করা হয়।

যাই হোক, পৌঁছে শিগগির দিলাম সেই অপরিহার্য উপকরণ। শ্রীশ্রীবামদেবের জন্য নিয়ে আসা ধুতিটিও দেওয়া হল। সাথে নীল অপরাজিতার মালা। পূজারী খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পূজা করলেন। আমরা পুষ্পাঞ্জলীও দিলাম শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার শ্রীবিগ্রহের চরণে। আরতি হল। পূজারী আমাদের প্রসাদ দিয়ে আগামীকাল বিকেলে আসতে বললেন। ঐ ধুতিখানি আগামীকাল বিকেলে পরানো হবে।

প্রশস্ত বেদীতে শ্রীশ্রীবামদেব বিরাজিত। আমরা বারান্দায় বসেছিলাম। এইবার ২০১৭ তে এই বামামিশনে পূজার সময় বেশ ভালো অনুভূতি হয়। সেই বিষয়টা পরে বলব।
মা তারা আর বামদেব যেন একই সত্তার দুই ভিন্নরূপ। কেউ কারোর থেকে পৃথক নন। বিধিমতো বামদেবের পূজার পর মনটা বেশ প্রসন্ন।

বামা মিশন

এগারো

তারামন্দিরের সামনের রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে একটু এগোলেই চোখে পড়বে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির। ভিতরে ঢুকলাম। ঐ সময়ে অপূর্ব সুরে শ্রীখোল সহযোগে কীর্ত্তন করছিলেন এক ভক্ত। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমরা শুনছিলাম কিছুক্ষণ। শ্রীশ্রীবাবা বলেন মা তারা হরিনাম শুনতে বড় ভালোবাসেন। তাই বুঝি মায়ের এই অলৌকিক ব্যবস্থাপনা। "মহাপীঠ তারাপীঠ" য়ে বাবা লিখেছেন সীতার 'তা' আর রামের 'রা' নিয়ে একসঙ্গে 'তারা'।

গর্ভগৃহে সুদৃশ্য রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। বাইরে তুলসীমঞ্চ। প্রণাম সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

আরও এগিয়ে রামকানাই যামিনীরঞ্জন ধর্মশালা চোখে পড়ল। শ্রীশ্রীবিপুলবাবা অজস্রবার এই ধর্মশালায় এসে থেকেছিলেন দীর্ঘদিন। যাক, ইতিহাসের স্মারককে চাক্ষুষ তো করা গেল। কমলা রঙের পলেস্তারা খসা দেওয়ালে ধর্মশালার নামটি কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। ভিতরে দু-এক জনকে দেখা গেল। আজকের এই হোটেল গেস্ট হাউসের রমরমা বাজারে কেউ আর এই প্রাক্তন হয়ে যাওয়া ধর্মশালায় আশ্রয় নেন বলে তো মনে হল না। তারাপীঠে এখন চারদিকে প্রচুর হোটেল। তিনতারা হোটেলও বর্তমান।

রামকানাই যামিনী রঞ্জন ধর্মশালা

অতীতে একটা সময় তারাপীঠে আগত ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল এই ধর্মশালা। দাদার লেখা "জীবন থেকে মহাজীবনের পথে-১" এ এই ধর্মশালার একটা সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আরও এগিয়ে চোখে পড়ল বামদেব সংঘের মন্দির। ভিতরে তখন শ্রীশ্রীবামদেবের আরতি চলছে। সুন্দর বিগ্রহ। বেশ বড় আকারের। আমরা আরতি দর্শন করলাম। পুরোহিত প্রসাদও দিলেন, একখানা লুচি আর হালুয়া। পূর্বদিকে সাধক সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাধি মন্দির। "মহাপীঠ তারাপীঠ" য়ে শ্রীশ্রীবাবা এনার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। প্রণাম জানালাম এই মহা সাধককে। প্রায় রাত্রি ৮ টা বাজতে চলল। এবার গেস্ট হাউসে ফিরতে হবে। কিন্তু তার আগে যে কিছু অনুসন্ধান বাকি রয়ে গেল!

বামদেব সঙ্ঘ

বারো

এবারের (২০১৫) তারাপীঠ দর্শনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সময়ের সরণি বেয়ে তারাপীঠ দর্শন এবং শ্রীশ্রীবিপুল বাবা, তাঁর মহান দিব্য সাধন জীবনে যেসকল ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন, সেই ইতিহাসকে একটু ছুঁয়ে যাওয়া, পারলে সেই ইতিহাসের কয়েকটা পাতা খুলে দেখা।

“মহাপীঠ তারাপীঠ-৫” এ সম্ভবতঃ অন্নপূর্ণা দেবীর উল্লেখ আছে। ইনি একজন গোপাল সাধিকা ছিলেন। তার ভাই সম্ভবতঃ তৎকালীন তারাপীঠের পান্ডা ছিলেন। আজ যেখানে বামদেব সংঘ তথা সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাধি মন্দির, এর কাছেই কোথাও সেই বিখ্যাত অশ্বত্থ গাছটি থাকবে। এই গাছটি অনেক দিব্য ঘটনার,

শ্রীশ্রীবামের অনেক দিব্য লীলার সাক্ষী। আমাদের শ্রীশ্রী বিপুল বাবাও এই বৃক্ষের বেদীমূলে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। “মহাপীঠ তারাপীঠ” থেকেই জেনেছি, অন্নপূর্ণা দেবী শ্রীশ্রীবাবার বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। অন্নপূর্ণাদেবীর বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীবিপুলবাবা ও তাঁর তৎকালীন শিষ্য ভক্ত অনুগামীরা একটি গোপাল মন্দির নির্মাণ করে দেন ঐ স্থানে। অন্নপূর্ণা দেবীর ভাইকে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও তিনি ঐ পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষটি কেটে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন। একটি ডাল কাটবার কয়েকদিনের মধ্যেই নাকি তার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

আমি সেই অশ্বত্থ গাছটাই খুঁজে চলেছি এখন। আর সেই গোপাল মন্দির। হ্যালোজেনের হলুদ আলোতেও যেন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা তারাপীঠ বড় অচেনা ঠেকছে। বইয়ের সঙ্গে যেন মিলতে চায় না।

“কি? কি বইলছেন? অন্নপুন্না!! না গো। ওই নামে তো কিছু জানি না বাপ। আগে অন্নপুন্না হোটেল আছে একখান। শুধিং লেন।” রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, ল্যাম্পপোস্টের একদম গায়েই অন্নপূর্ণা হোটেল। আর তার গা বেয়ে একখানা অশ্বত্থ গাছের ডাল। ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম অন্নপূর্ণা দেবী, তার ভাই আর গোপাল মন্দিরের ব্যাপারে। একটি খুব কমবয়সী ছেলে বসে ছিল অফিসে। সম্ভবতঃ মালিকের ছেলে হবে। বলল সে এসব কিছুই শোনে নি। তবে একটি গোপাল তাদের বাড়িতে পূজিত হয়। কোন মন্দিরের কথা সে জানে না। আর হোটেলের ভিতর থেকে উঠে আসা অশ্বত্থ গাছ দেখিয়ে বলল, এই গাছটা কোন কারণে কাটা হয় নি। গাছ সমেতই হোটেল হয়েছে।

অন্নপূর্ণা হোটেল এর গায়ে সেই অশ্বত্থ গাছ

বোঝা গেল! ছেলেটি সম্ভবতঃ অন্নপূর্ণা দেবীর ভাইয়ের বংশধর। গোপাল মন্দিরের জায়গায় বর্তমানে অন্নপূর্ণা হোটেল স্বমহিমায় বিরাজ করছে। আর গোপাল বিগ্রহটি তাদের বাড়ীতে পূজিত হচ্ছে। যাক, ইতিহাসের তল পাওয়া গেল।

ফিরে যাচ্ছি উত্তরের রাস্তা ধরে গেস্ট হাউসের পথে। তারা মন্দির পেরোবার পর পশ্চিম দিকে দুটি দোকানের মাঝে ছোট্ট একটা ঘাট মতো। এই তো সেই ঘাট!!! হ্যাঁ, আমার যতদূর মনে পড়ছে, এই সেই ঘাট যেঘাটের সংস্কার করিয়েছিলেন শ্রীশ্রীবিপুল বাবা ও তাঁর তৎকালীন শিষ্যবর্গ। একটা ফলকও ছিল যতদূর জানি। এগিয়ে গেলাম। গ্রীলের দরজা ঠেলে নামতে হয় জীবিতকুন্ডের এই ঘাটে। কিন্তু কোথাও কোন ফলক নেই। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ

বা অন্যকেউ হয়তঃ নতুন সংস্কারের সময় ইতিহাসের সেই পুরোনো স্মৃতি ধরে রাখতে চায় নি।

যাই হোক ফিরে যাই গেস্ট হাউসে। রাতের খাবার ওখানেই বলা আছে। রুটি আর সবজী। সকলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের কর্মী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মী। আর ব্যবহারও খুব ভালো।

তেরো

আজ মহাষ্টমী (২০১৫)। তারা মন্দিরের দিকে যাবার সময় একটু এগোতেই বঁদিকে জয় মা কালী অভেদ আশ্রম। বেশ করে সাজানো প্রবেশ দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করতেই দর্শন পেলাম একচালায় সুসজ্জিতা মা দশভুজা, সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। পাশেই রয়েছে আশ্রমের সারাবছর পূজিতা মা কালী। আমপাতা, রঙিন কাগজ আর রংবেরঙের লাইট দিয়ে সাজানো মন্ডপ। বেশ একটা সাবেকী গেরস্ত বাড়ীর পুজোর গন্ধ এখানে। বারোয়ারী থিমের বাড়াবাড়ি নেই। পুরোহিতও বেশ ভালোই পুজো করছেন। কোন তন্ত্রধারক নেই। মা প্রসাদের ডালাটা জমা দিয়ে নাম লিখিয়ে দিল। আমরা সানন্দে মহাষ্টমীর অঞ্জলী দিলাম মায়ের শ্রীচরণে। মা দুর্গার মুখমন্ডলে রক্তিম আভা। ১০৮ পদ্মমালা পরিহিতা। গলায় ও কানে স্বর্ণালঙ্কার। আমরা প্রসাদ গ্রহণ করে অপেক্ষা করলাম। অষ্টমী পূজা শেষে সন্ধিপুজো। অপূর্ব আরতি হল।

১০৮ প্রদীপ জ্বলে উঠল। পুরোহিত বেশ হেলে দুলে দৃষ্টিনন্দন আরতি করলেন। মাও সন্ধিপুজোর প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এল।

জয় মা কালী অভেদ আশ্রম

অভেদ আশ্রম থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই একটা কাঁচা রাস্তামতন। ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে ডানদিক ঘুরলেই তারাপীঠের বিখ্যাত এক আশ্রম যেখানে মাকামাখ্যা ও মা বগলামুখী পূজিতা হন। আমরা মহাপীঠ তারাপীঠে এর উল্লেখ পেয়েছিলাম। দর্শন করে বেরিয়ে গেস্ট হাউসে ফিরে গেলাম। হাল্কা টিফিন করে নিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। আজ অনেক দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে।

চোদ্দ

একজন অটোচালকের সঙ্গে কথা বলাই ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকাল ৯-৩০ নাগাদ সে চলে এল গেস্ট হাউসের সামনে। আমরা "দোহাই মা চন্ডী শ্রীদূর্গা জয় তারা" বলে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য শ্রীশ্রীবামদেবের জন্মস্থান আটলা গ্রাম। রামপুরহাট রোড থেকে বাঁদিকে ঘুরতেই চোখে পড়ল হোটেল সোনার বাংলার পেছনেই নিরঞ্জনী আখড়ার আশ্রম। সামনে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। আর রয়েছেন প্রায় তিন মানুষ লম্বা বজরংবলীর মূর্তি। মহন্ত মহাশয় আমাদের ছবি তুলতে বাধা প্রদান করলেন। অগত্যা এগিয়ে চললাম।

জন্মস্থানে শ্রীশ্রীবামদেবের মূর্তি

এগিয়ে চলেছি গ্রাম্য পথে। পিচের এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে চলেছে আমাদের বাহন। দুপাশে ধানক্ষেত। রাস্তায় হাস মুরগি এমন নিঃশঙ্ক ভাবে চলাফেরা করছে যেন যানবাহনই এই রাস্তায় নিষিদ্ধ। শ্রীশ্রীবাবা বলেন, তারাপীঠ ও সংলগ্ন এলাকার প্রতিটা জীব মা তারার অসীম কৃপাপ্রাপ্ত।

শেষ পর্যন্ত পোঁছলাম আমাদের গন্তব্যে। রাস্তার বাম পাশে সাইড করে অটো তার জায়গা করে নিল। আমরা চটি জুতো গাড়ীতেই খুলে রেখে নেমে হ্যান্ড পাম্পের জলে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে রাস্তার ডান দিকে বটবৃক্ষের ছায়ার টিনের চালের এক ছোট্ট মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। এটি হল শ্রীশ্রীবামদেবের বংশপরম্পরায় পূজিতা সিদ্ধেশ্বরী কালী। মায়ের ছোট্ট অথচ আকর্ষণীয় প্রতিমা। মহাপীঠ তারাপীঠে উল্লেখ আছে এই স্থানের। এখানেই শ্রীশ্রীবামদেবের বড় দিদির সিদ্ধিলাভ ঘটে ছিল। এটি তার সাধনস্থল। তাঁর পিতার সঙ্গে শ্রীশ্রীবামও এখানে পূজা করেছেন। আদি অকৃত্রিম মায়ের বিগ্রহ, “শ্যামা মা কি আমার কালো রে” র প্রতীকী উপস্থাপনা।

মা সিদ্ধেশ্বরী কালী

একটু এগিয়ে গেলাম পিচ রাস্তা ধরে। হঠাৎ এপাশ ওপাশ থেকে ডাকাডাকি। “আসেন মা, আসেন বাবু। ঐ দ্যাখেন বামাক্ষ্যাপার আঁতুর ঘর।” প্রায় হাত ধরে টেনেই নিয়ে যাবেন মহিলা। বাধ্য হয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলতে হল, আমরা জানি। উনি আমাদের ডানদিকের একটি গলিপথের একটা বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইছিলেন।

এপ্রসঙ্গে বলে রাখি, মহাপীঠ তারাপীঠে খুব পরিষ্কার ভাবে ব্যাপারটা বলা আছে। আর যাবার আগে শ্রীশ্রীবিপুলবাবাও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ওখানে শ্রীশ্রীবামদেবের আসল জন্মস্থানে শ্বেত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে বামমহেশ্বর শিবলিঙ্গ বলা হয়। আর মন্দিরটি একেবারে পাকা রাস্তার উপরেই অবস্থিত। কোন ডাইনে

বাঁয়ে ঘুরতে হবে না। “যান, যান। দ্যাখেন গিয়ে সব নকল আঁতুর। বইলছি তো শুনে না বাপু! ছেড়ে দে । এ্যারা আসবে নাই কো।”

বাম মহেশ্বর শিব লিঙ্গ

লাল রঙের দেওয়ালে সাদা অক্ষরে বড় বড় করে লেখা “শ্রীশ্রীবামদেবের জন্মস্থান”। ভিতরে প্রবেশ করলাম। মার্বেলের মেঝেতে ঠিক ডানদিকে প্রতিষ্ঠিত শ্বেতপাথরের বিরাট বামমহেশ্বর শিবলিঙ্গ। গ্রামাঞ্চল বলে আমরা আগে থেকেই পুজোর উপকরণ জোগার করে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। শিবলিঙ্গে দুধ , বেলপাতা, আকন্দ, ধুতুরা নিবেদন করে শান্ত, সৌম্যকান্তি অত্যন্ত ভদ্র অল্পবয়সী পুরোহিত শুরু করলেন “ওঁ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়ে হেতবে~~~~”। বামদিকে কাঠের সিংহাসনে শ্রীশ্রীবামদেবের

প্রস্তরমূর্তি বিরাজমান। দুই চোখ যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড এবং তাতে আগন্তুকের ভুত-ভবিষ্যত-বর্তমান সব কিছু ধরা পড়ে যাচ্ছে। আমরা শ্রীশ্রীবামকে একটি সদৃশ্য নীল অপরাজিতার মালা ও আকন্দ অর্পণ করে পুষ্পাঞ্জলী দিলাম মনের আনন্দে। পুরোহিত আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে যথা সম্ভব আমাদের পরিচয় প্রদান করে বললাম যে, মহাপীঠ তারাপীঠ পাঠ করেই আমরা মা তারার দর্শনে এসেছি। উনি দেখলাম বইটি সম্পর্কে অবহিত এবং শ্রীশ্রীবিপুল বাবার নামও জানেন। শ্রীশ্রীবামদেবের জন্মস্থান সংক্রান্ত পারিবারিক কলহের কথা কিছু বলছিলেন।

তারপর কিছুতেই আমাদের ছাড়লেন না। ঠিক রাস্তার উল্টোদিকেই ওনার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। টিনের চালা দেওয়া মাটির বাড়ী, পাকা মেঝে। বাড়ীর ভিতরে ধানের মড়াই। একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে দৌড়ে এল। মেয়েটি পুরোহিত মশাইয়ের কন্যা। সঙ্গে কিছু না থাকায় মেয়েটির জন্য খুব জোর করেই পুরোহিত মশাইকে কিছু দিলাম কিনে দেবার জন্য। ওনার মা, স্ত্রী, দিদি এবং ভাগ্নের সঙ্গেও পরিচয় হল। বড়ই আন্তরিক তাদের ব্যবহার। এক ধরনের ঘরে তৈরী পাঁপড় আর চা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ণ করলেন। তাদের এই আতিথেয়তা কখনো ভুলবার নয়। এতে লেনদেন বা শহুরে দেখনদারির কোন জায়গা নেই। যাই হোক, আমার ভাইয়ের নামে শ্রীশ্রীবামমহেশ্বরকে ভোগ লাগানোর জন্য কিছু দক্ষিণা প্রদান করে অটোতে উঠে বসলাম। বলতে ভুলে গেছি, উনি আমাদের

শ্রীশ্রীবামদেবের ভোগের পায়েস প্রসাদ দিয়েছিলেন, যা এক কথায় অমৃততুল্য।

শ্রীশ্রী বামদেবের জন্মস্থান

পনের

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মুলুটি। স্থানটি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ঝাড়খন্ডের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ওখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। আমরা সাঁকো পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠলাম। দুপাশে শাল গাছের নিবিড় জঙ্গল। মাথার উপর গনগনে সূর্যদেব। অনেকটা রাস্তা গিয়ে তারপর আবার ছোট রাস্তা। এতক্ষণে

আমরা ঝাড়খন্ডে প্রবেশ করে ফেলেছি। মালভূমি অঞ্চলের কিছু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবার একটি নালা মত পার হলাম। তারপর পাথর ভাঙার কিছু কল পেরিয়ে ডানপাশে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন জুড়ে মা মুলুটেশ্বরীর মন্দির। সামনে হিন্দী এবং বাংলাতে লেখা মন্দিরের পরিচয়। এটি একটি সতীপীঠ। প্রবেশ করেই ডানদিকে বেশ কয়েকটি ডালার দোকান। আমরা একটি দোকান থেকে পুজো সামগ্রী কিনে এগিয়ে গেলাম মা মৌলীক্ষা কে দর্শন করতে। বিরাট প্রশস্ত নাট মন্দির। সামনেই হাঁড়িকাঠ। এর পর মায়ের গর্ভগৃহ। ছোট্ট অথচ সুন্দর। মা মৌলীক্ষার মুখমন্ডল সিন্দুর চর্চিত। তার উপরে রূপোর ত্রিনয়ন এবং অর্থচন্দ্র। এত অপূর্ব। মুখমন্ডলটি পরিষ্কার দৃশ্যমান। কোন পাথরের উপর সিঁদুর মাখানো নয়। নাকে সুন্দর নথ এবং অধরদেশ বর্তমান। পুরোহিত খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের পুজো করিয়ে দিলেন। আমরা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে নিকটবর্তী কল থেকে পিপাসা মেটালাম। মন্দিরের ডানপাশেই মায়ের ভৈরব মহাদেবের মন্দির। একটি শিবলিঙ্গ শোভা পাচ্ছে। আমরা ধূপ দীপ জ্বালিয়ে নিজেদের মতো করে শিবলিঙ্গ ও মৌলীক্ষা মায়ের অর্চ্চনা করলাম। দুদন্ড জিরিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু।

মা মৌলীক্ষা

ওখান থেকে সোজা রাস্তা ধরে ঝাড়খন্ডের ভিতরে আরও এগিয়ে গিয়ে কয়েক কিলোমিটার যাবার পর শ্রীশ্রীবামদেবের মামার বাড়ী পড়ল। এখানে কিছু লাগোয়া বাড়ী ঘরের ভিতর দিয়ে কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যে। একটি ছোট্ট মন্দির। ভিতরে মা কালীর মূর্তি। পাশে শ্রীশ্রীবামদেবের ও একটি মূর্তি। কথিত আছে, শ্রীশ্রীবাম

ব্যবহৃত ত্রিশূলটি এখানেই সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা সেই ত্রিশূলটিও দর্শন করলাম। একটি বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে আমাদের ঐ ঘটনাসমূহ ব্যক্ত করলেন। আমরা ওনাকে কিছু দক্ষিণা প্রদান করে এগিয়ে গেলাম অটোর উদ্দেশ্যে। আসলে প্রত্যন্ত গ্রাম হওয়ায় এইসব স্থানে পুণ্যার্থী বড় একটা আসেন না। আর তার ফলে এদের দৈনিক আয়ও খুব একটা হয় না।
ফিরতি পথে এগিয়ে চলেছি পশ্চিমবঙ্গের সীমানায়। দেখবেন, ফেরার পথ সবসময়ই আসার পথের তুলনায় কম মনে হয়। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই।

বামদেবের মামার বাড়ি

ষোল

আটলা রোড ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি রামপুরহাট রোডের দিকে। মোড়ে পৌঁছে বাম দিক নিল আমাদের অটো। আমাদের এই যাত্রার শেষ গন্তব্য উদয়পুর। তারাপীঠ ছাড়িয়ে রামপুরহাটের পানে কিছুদূর গিয়েই বামদিকে ছোট রাস্তা নিল আমাদের বাহন। দুপাশে আখের ক্ষেত। একটা ছোট্ট নালা পেরিয়ে দেখি কিসের যেন জটলা সাঁকোর উপর এবং পার্শ্ববর্তী জমিতে। কিছু কমবয়সী ছেলে ওখানে সুরাপানে মত্ত। ড্রাইভারকে দ্রুত গাড়ী এগিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। কিছুটা যাবার পর জনবসতি চোখে পড়ল। এঁকে বেঁকে রাস্তা চলেছে। দুপাশে বাঁশবন। কিছুটা এগিয়েই ডানপাশে আমাদের অটো এসে থামল। হাল্কা সবুজ রং করা মন্ডপ। পাকা দালান, টিনের ছাদ। আর সামনে গ্রীল দেওয়া। ততক্ষণে পূজা সমাপ্ত। তালা মারা হয়ে গেছে। আমাদের অটো ড্রাইভারটি তারণকর্তা হয়ে পাশের একটি বাড়ীতে ঢুকে পুরোহিত মশায়কে ডেকে নিয়ে এল। উনি তালা খুলে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন। ভিতরে লম্বাবেদী। তার উপর মাকালীর প্রতিমা তৈরী করে পুজো হয় কালীপূজায়।বেদীর সামনেটায় মা কালীর মুখমন্ডল সিন্দুর চর্চ্চিত, অনেকটা ঐ সতীপীঠগুলির মতো। চক্ষু, নাসিকা, অধর, জিহ্বা বর্তমান। ইনিই উদয়পুরের বিখ্যাত মা কালী। পিছনের দেওয়ালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদাদেবীর

প্রতিকৃতি। পুরোহিত মশায় আমাদের বিধিমতো পুজো করিয়ে দিলেন। আমরাও মনের শান্তি নিয়ে অটোয় চড়ে বসলাম।

উদয়পুরের মা কালী

ফিরে আসছি আমাদের গেস্ট হাউসে। যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে। খাবারের কথা বলাই ছিল। এত দেরী হওয়া সত্ত্বেও ওনারা হাসিমুখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মৎস্যদপ্তরের এই গেস্ট হাউসের কর্মীদের দায়বদ্ধতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আজ অনেক দর্শন হল। মুলুটির মা মৌলীক্ষা এবং উদয়পুরের মা কালীকে বলা হয় মা তারার দুই বোন। মা তারা নাকি প্রায়শঃই তাঁর এই দুই বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা

হন। শ্রীশ্রীবাম ও তাই অপার শ্রদ্ধা রাখতেন এই দুই দেবীর প্রতি। কখনো কখনো দ্বারকা নদীর জলে পদ্মাসনে ভাসতে ভাসতে উদয়পুর পৌঁছে যেতেন, পায়ে হেঁটে পৌঁছাতেন মুলুটি। "মহাপীঠ তারাপীঠ" আমাদের সম্পূর্ণ তারাপীঠ কে প্রাণ ভরে দর্শন করতে দিকনির্দেশ করেছে। সমৃদ্ধ করেছে আমাদের ভাবজগতকে।

জয় জয় তারা জয় জয় বাম।

সতেরো

সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরী নেই। আজই তারাপীঠে শেষ রাত্রি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

দ্বারকা নদীর সেতু পেরিয়েই ডানদিকে তারা মন্দিরের রাস্তা। আর বাঁদিকের রাস্তা চলে গেছে মুন্ডমালিনী তলার দিকে। আমরা বাঁদিকের রাস্তা ধরলাম। বেশ কিছুটা চলার পর আমরা পৌঁছালাম মুন্ডমালিনী তলায়। ল্যম্প পোস্টগুলোই টিমটিমে হলুদ আলো জ্বলতে শুরু করেছে। মূলরাস্তা থেকে একটা ঢালাই করা রাস্তা বামদিকে নেমে গেছে মুন্ডমালিনী তলার দিকে। ঘিরে ধরল ৭-৮ টা কুকুর। আর তারস্বরে চিৎকার। এক বয়স্ক মহিলা এগিয়ে এসে কুকুরগুলিকে মৃদু ভর্ৎসনা করাতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওরা সরে গেল। আমরা

এগিয়ে গেলাম মুন্ডমালিনী তলায়। বেশ সুন্দর নাটমন্দির। তার সামনে মূল মন্দির।

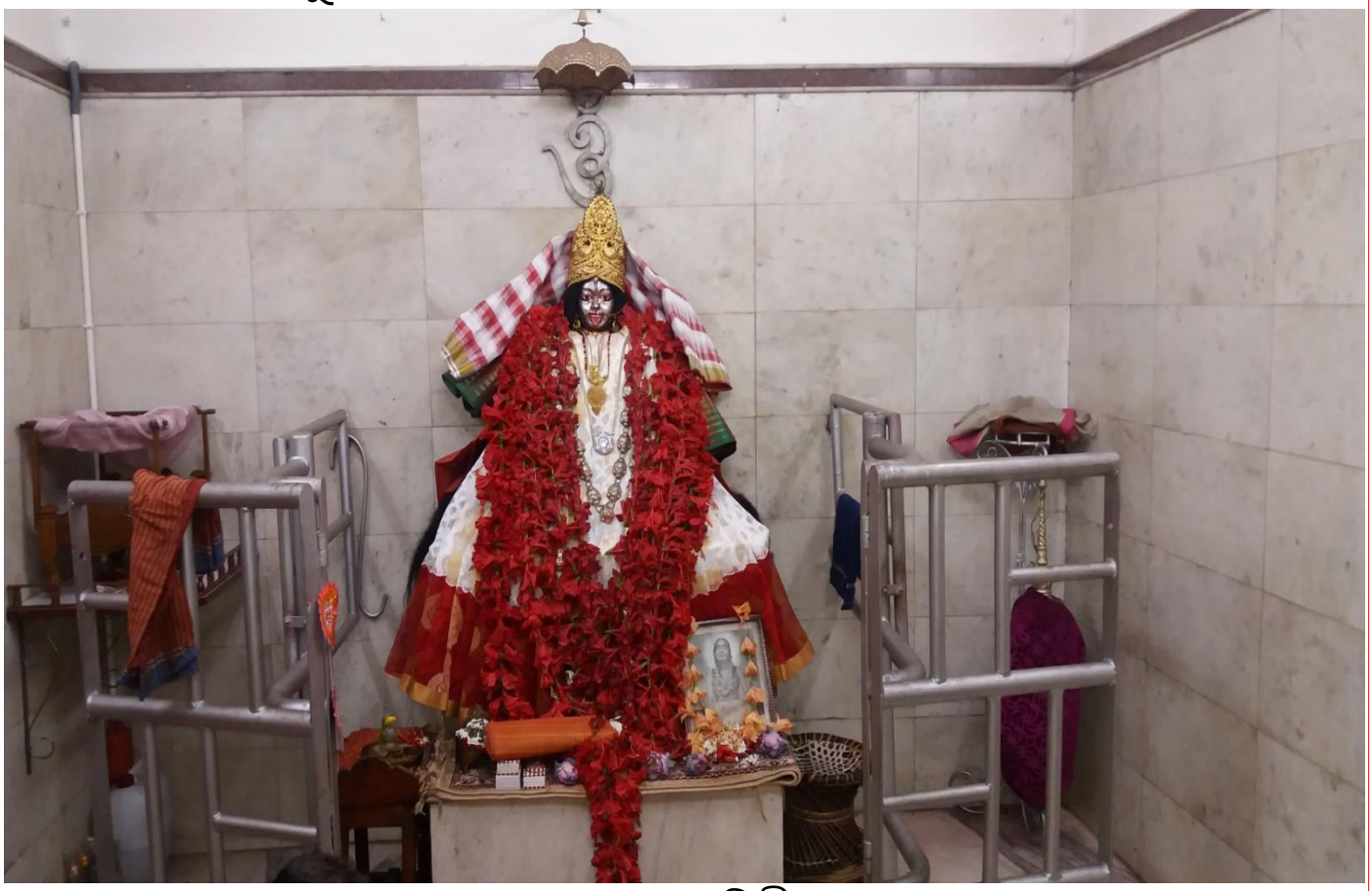

মা মুন্ডমালিনী

মহাপীঠ তারাপীঠে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। কথিত আছে একবার বশিষ্টদেব মা তারার সাধনা করতে করতে মাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, যে এই স্থানে প্রকৃতই তারাদেবী বিরাজ করছেন কিনা। তো মা তারা তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গলার মুন্ডমালা/করোটির মালাটি খুলে রেখে দ্বারকা নদীতে স্নান করতে যান। বশিষ্টদেব সেই মালাটি দেখতে পান। তখন দৈববাণী হয় যে এই স্থান নয়, তারাপীঠ মহাশ্মশানের সিদ্ধাসনে তপস্যা করতে হবে। সেই থেকে এই স্থানের নাম হয় মুন্ডমালিনী তলা।

এই মন্দির মূলত যাঁর উদ্যোগে নির্মিত হয়, তিনি এখানকার বিশিষ্ট সাধক ছোটবাবা নামে খ্যাত। বর্তমানে দেহ রেখেছেন। মূল মন্দিরের বামদিকে ছোটবাবার মন্দির। আর গর্ভগৃহের ডানপাশে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহের পিছনের দিকে ছোটবাবার সমাধি মন্দির। আর গর্ভগৃহের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত মা তারা। রূপোর মুখমন্ডলে কি অপূর্ব সৌন্দর্য্য আর স্নিগ্ধতা। মাকে পড়ানো হয়েছে খুব সুন্দর একটি সাদা শাড়ী। ছোট্ট লাল পাড়। আমার মা বলল শাড়ীটা ঢাকাই জামদানী। অপূর্ব শাড়ী। সাদার উপর সাদা কাজ। আর সোনার হার কানের দুল ও সোনার নথ পড়ানো। কি জ্যোতি আর সৌন্দর্য্য! আমার মা মিষ্টির প্যাকেট এগিয়ে দিলে ঠাকুর মশাই বললেন, “মা, এখানে দুধের মিষ্টি নিষিদ্ধ। আপনি যখনই আসবেন পাঁচ ফল আর বাতাসা নিয়ে পুজো দেবেন।” শেষে স্থানীয় দোকান থেকে বাতাসা কিনে মা তারাকে পুজো দেওয়া হয়। আমরা মাকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে।

বেরিয়ে আসবার সময় ঐ বয়স্কা মহিলাকে দেখলাম। চেহারা দেখে সাধিকা বলেই মনে হল। সাদা পোশাক পরিহিতা। আমাদের বলল কিছু সাহায্য করতে। আমরা সাধ্যমত করলাম। মন্দিরের পিছনেই মুন্ডমালিনী তলা শ্মশান। ওখানে দ্বারকা নদীর যে ঘাট, তাকে বলা হয় সতীমায়ের ঘাট। নিচে নেমে দ্বারকা নদীর জল মস্তক স্পর্শ করালাম। একটু চা পান করে সন্ধ্যের মায়াবী আলোয় পথ

চলতে চলতে বেরিয়ে এলাম। অক্টোবরের তারাপীঠে সাঁঝবেলায় হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

সতী মায়ের ঘাট

আঠেরো

তারাপীঠ রোডের দিকে এগিয়ে চলেছি। বাঁদিকে এক বিরাট অট্টালিকা চোখে পড়ল। বাঁদিকের ঢাল বরাবর নিচে নেমে গেলাম। সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বাঁদিক থেকে শুরু করে তিনদিক ঘিরে চারতলা বিরাট বিল্ডিং। একদম সামনে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে একটি মন্দির মতো। এগিয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠলাম। টিউব লাইটের আলোয় উজ্জ্বল নগেন বাগচীর প্রতিমা। সেই নগেন বাগচী,

শ্রীশ্রীবামদেবের শিষ্য, যাঁকে শ্রীশ্রীবাম নগেন বাবা বলে ডাকতেন। আমাদের শ্রীশ্রীবিপুল বাবাও ছিলেন নগেন বাগচীর অশেষ স্নেহ ভাজন। এমন কি নগেন বাগচীর শেষ সময় ঠিক কখন আসবে তাও ত্রিলোকজননী মা তারা শ্রীশ্রীবিপুল বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম। বাইরে আরেকটি প্রতিকৃতি রয়েছে নগেন বাবার। প্রতিকৃতি দেখেই বোঝা যায় নগেন বাবা ঠিক কতটা দীর্ঘদেহী ছিলেন। মূর্তির পাদস্পর্শ করে প্রণাম জানালাম সেই মহাত্মাকে। পাশের বিল্ডিংটি আশ্রমিকদের জন্য সেটা বোঝা গেল।

নগেন বাগচীর মূর্তি

উঠে এলাম মূল রাস্তায়। তারাপীঠ রোডের দিকে এগিয়ে চলেছি। ডানদিকে লাল রঙের বিরাট বিল্ডিং ও বিদ্যালয়। এটি ভারত সেবাশ্রমের তারাপীঠ শাখা। তার একটু আগেই ভারত সেবাশ্রমের

মন্দির। আমরা ভারত সেবাশ্রমের অফিস ও বিদ্যালয়টিকে বামদিকে রেখে ডানদিকের মন্দির কমপ্লেক্সে প্রবেশ করলাম। সুদৃশ্য তোরণদ্বার তিনতলা বিশিষ্ট, যার প্রথম তলে গণপতি, দ্বিতীয় তলে মা তারা ও তৃতীয় তলে নীলকন্ঠ মহাদেব বিরাজ করছেন। তোরণদ্বার পেরিয়ে এগিয়ে চললাম । দুপাশে সুন্দর ফুলের বাগিচা। গোলাপ, টগর, অপরাজিতা, জুঁই, বেলী, মাধবীলতা ও লাল-হলুদ-সাদা-কমলা নানা বর্ণের জবা ফুলের গাছ। এগিয়েই আমরা ডানদিকে ঘুরে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। অপূর্ব কারুকার্য মন্ডিত মন্দির। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। সামনেই বিরাট রথ। তাতে রথারুঢ় হয়ে রয়েছেন ধনুর্ধারী অর্জুন আর রথ চালনা করছেন পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ । ভিতরে প্রবেশ করলাম, বিরাট হল ঘর। প্রবেশ মুখের দুইপার্শ্বে দুটি কাচের শিশির মন্দির মতো। ঠিক হোমিওপ্যাথির ওষুধের শিশিগুলো যেমন দেখতে হয় সেইরকম। অসংখ্য শিশি একটার পর আরেকটা জুড়ে মুখোমুখি দুটো মন্দির বানানো হয়েছে। একটিতে মহাদেব ও অপরটিতে আচার্য্য প্রণবানন্দ বিরাজমান। মার্বেলের মেঝে পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। মূল গর্ভগৃহে প্রণবানন্দজীর অপূর্ব বিগ্রহ। বামপাশের গর্ভগৃহে মা কালী বিরাজিতা। তাঁর ঠিক সামনেই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। আর ডানদিকের গর্ভগৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। তাঁদের সিংহাসনের চারপাশে ছোটবড় নানান সাইজের অসংখ্য নাড়ুগোপাল। পুরোহিত মশায় সন্ধ্যারতি করছিলেন। দারুণ পরিমন্ডল। দর্শন করে আমরা দরজার দিকে এগিয়ে এসে ডানপাশের সিঁড়ি দিয়ে মাটির তলার বিরাট হলঘরে প্রবেশ করলাম। হলঘরের দেওয়ালে নানা প্রতিকৃতি খোদাই

করা। দক্ষিণদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কালীয়দমন লীলা, পশ্চিমদিকে ননীচুরী ও আরও বাল্যলীলা, উত্তরদিকে সমুদ্রমন্থন ও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশাবতার এবং পূর্বদিকে মা মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিকৃতি। হলঘরের ঠিক মাঝখানে ঘূর্ণায়মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা অষ্টসখী পরিবৃত হয়ে।

ঘূর্ণায়মান মূর্তি

খুব সুন্দর দর্শন সেরে উপরে উঠে এলাম। ভারত সেবা শ্রম থেকে যখন বেরোচ্ছি তখন প্রায় রাত্রি ৮টা। তারাপীঠের বেশিরভাগ দোকান বাজারই বন্ধ। আমি একবার শ্রীশ্রীবিপুল বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, "মহাপীঠ তারাপীঠ-৫" এ এত এত মহাত্মার কথা আছে, তো আচার্য্য প্রণবানন্দজীর কথা নেই কেন? শ্রীশ্রীবাবা বলেছিলেন যে, দেখ এরা প্রত্যেকে কখনো না কখনো তারাপীঠে

সাধনা করেছিলেন। কিন্তু প্রণবানন্দজী তো তারাপীঠে কখনো আসেন নি। তাই বইতেও উল্লেখ করা হয় নি।

আজ তিনরাত্রি অতিবাহিত হতে চলেছে। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি গেস্ট হাউসের পথে। রাতের মেন্যু রুটি আর আলু পটলের সব্জি।

ভারত সেবাশ্রম মন্দির

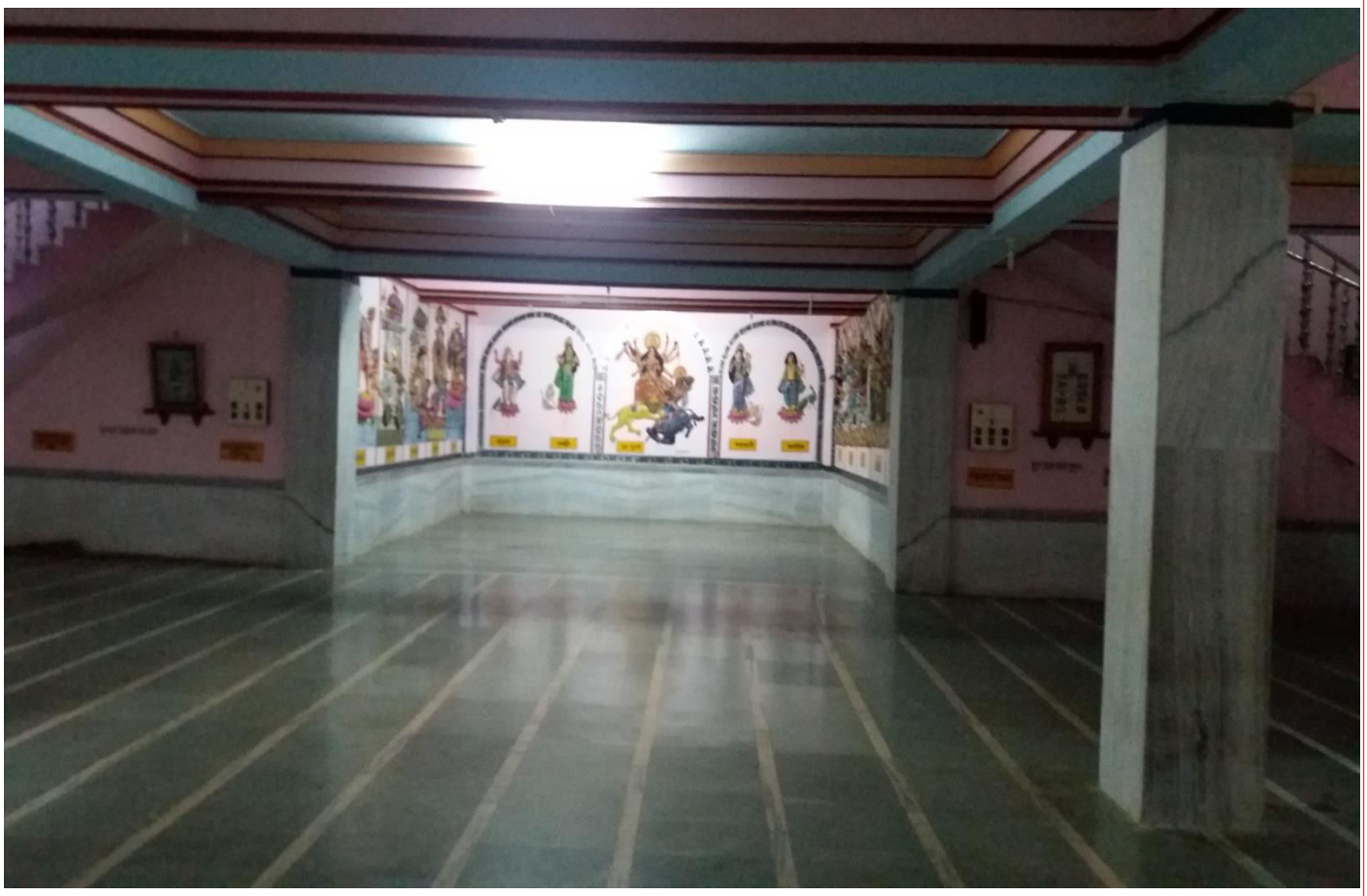

ভারত সেবাশ্রম basement

ভারত সেবাশ্রমে দেওয়াল চিত্র

দেওয়াল চিত্র

রাধাকৃষ্ণ ভারত সেবাশ্রম

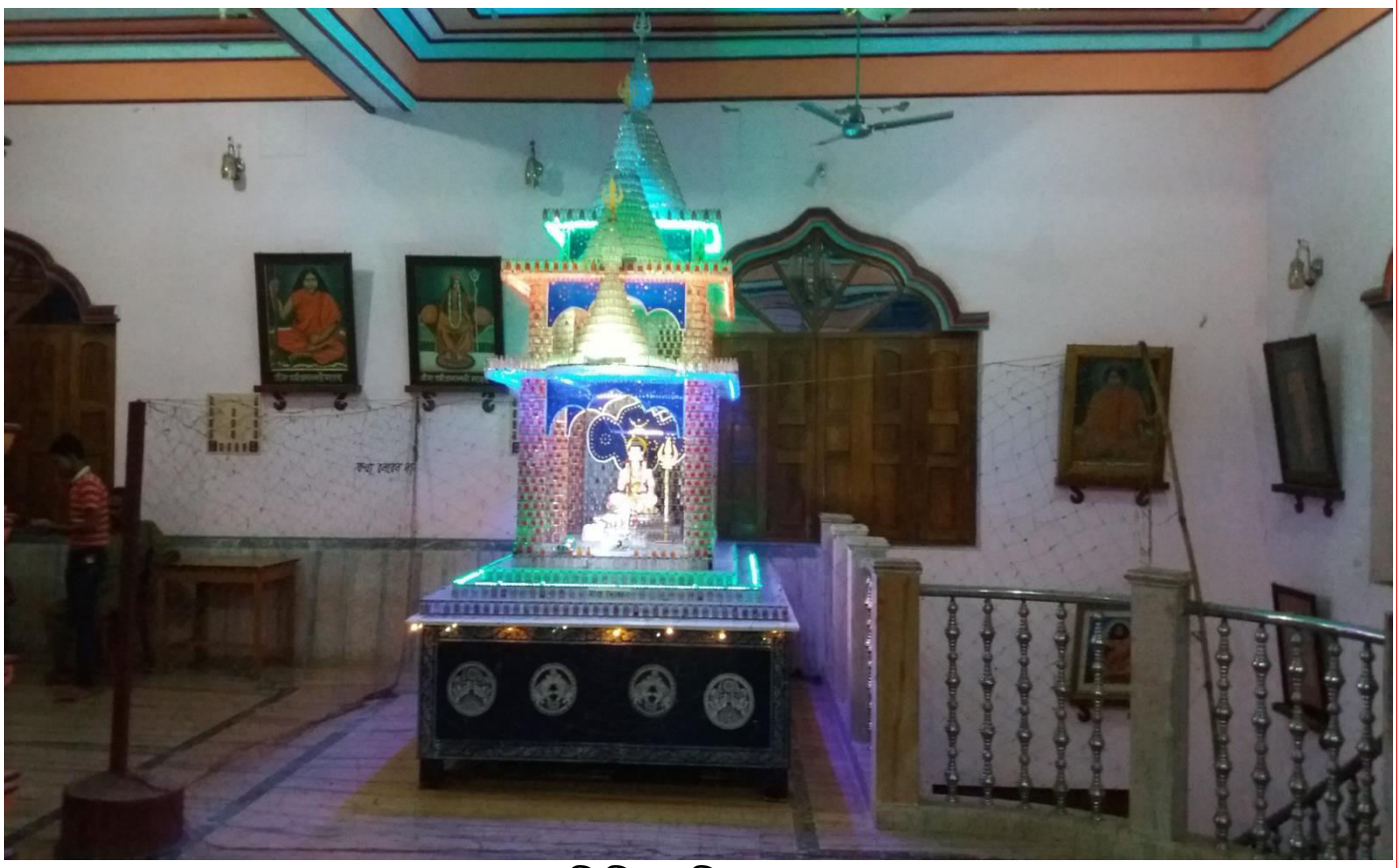

শিশির সিংহাসন

মা কালী ভারত সেবাশ্রম

উনিশ

আজ নবমী তিথি (২০১৫) সকাল ১০ টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব তারাপীঠ থেকে। সকাল বেলা একবার বেরিয়ে পড়লাম মা তারার দর্শনের অভিলাষে।

তারাপীঠের একটা বড় সমস্যা হল, তারা মন্দিরের রাস্তায় জনা ৫০ বা তারও বেশি ভিক্ষাজীবী ঘুরে বেড়ায় এবং আপনি একবার কোন একজনকে দিলেও সে রোজ আপনাকে দেখলেই ছুটে আসবে!! কখনো কখনো ধৈর্য্য রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে নিঃশব্দে ওদেরকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। কারণ এরা সকলেই মা তারার আশ্রিত। তাই এটাকে পরীক্ষা হিসেবে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর কিছু মানুষ ঘুরে বেড়ায় তারাপীঠে যারা অল্প সিদ্ধাই শক্তির অধিকারী। এরা মুখ দেখে আপনার জীবনের কিছু তথ্য বলতে থাকবে এবং তারপর আপনার পিছু পিছু আসবে কিছু লাভের আশায়। কিছু মুসলিম সাধকও এই তালিকায় রয়েছে। এদেরও সযত্নে পরিহার করা প্রয়োজন।

আমরা তারা মন্দিরে প্রবেশ করে মাকে জানালাম প্রাণের প্রণতি। নাট মন্দির থেকেই মায়ের দর্শন লাভ করলাম লাইন দেবার ভয়ে।
তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরদিকে সামান্য একটু এগোলেই বাঁদিকে মা আনন্দময়ীর আশ্রম। আমরা আশ্রমে প্রবেশ করলাম। নিচে নেমে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল ডানদিকে মা আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠিত নর্মদা শিবলিঙ্গ। গৌরীপট্টের উপর প্রতিষ্ঠিত বেশ বড়

শিবলিঙ্গ ধূসর বর্ণের। ঠিক উল্টোদিকেই বেশ বড় প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মা আনন্দময়ীর প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত। সঙ্গে রয়েছে মায়ের পূজিত গোপালসোনার বিগ্রহ। মন্দিরের ছাদ ঢালাই করা। মোজাইক করা মেঝে। আরও এগিয়ে আশ্রমিকদের বাসস্থান। মা আনন্দময়ীর মূর্তিতে অপূর্ব শাড়ী পড়ানো হয়েছে। মায়ের মাতৃভাব সদা প্রস্ফুটিত। শ্রীশ্রীবিপুল বাবা মা আনন্দময়ীর অশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁর “মহাপীঠ তারাপীঠ-৫” মা আনন্দময়ীকেই উৎসর্গ করেন।

মা আনন্দময়ী

কনকনে শীতের রাতে মা আনন্দময়ীর জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় জীবীতকুন্ডের জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটা বা ভাইজী কে মা তারার দর্শনদান প্রসঙ্গ মা আনন্দময়ীর ব্যক্ত করা~~ এই দিব্য অমর কথাগুলি নিমেষে মনে পড়ে গেল।

নাহঃ, এবার ফেরার পালা। আমরা গেস্ট হাউসের রাস্তা ধরলাম।

কুড়ি

গতকাল বিকেলেই একজন অটোচালকের সাথে কথা বলে রেখেছিলাম। অটোওয়ালা ঠিক সকাল ১০-৩০ এ গেস্ট হাউসে পৌঁছে গেল। পেমেন্ট তো কলকাতা থেকেই করা ছিল। আমরা বাকি যা ফর্ম্যালিটি ছিল সব মিটিয়ে ব্যাগ পত্র নিয়ে অটোয় চড়ে বসলাম। আমাদের এবারের গন্তব্য ডাবুক।

রামপুরহাট সাঁইথিয়া রোড ধরে এগিয়ে চলল আমাদের অটো। বেশ কয়েক কিলোমিটার চলার পর রাস্তা দুভাগ হয়ে গেছে। এবার আমরা ছোট রাস্তা ধরে এগিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। মেঠো পথ ধরে ধুলো উঠিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের অটো। দুপাশে কখনো ফাঁকা জমি, কখনো ধানক্ষেত, কখনো বা পুকুর। রাস্তাটা কখনো এতটাই সরু যে ওপাশ থেকে কোন গাড়ী এসে গেলেই মুস্কিল। চলতে থাকল অটো, সঙ্গী অক্টোবরের মিঠে কড়া রোদ।

এই ডাবুক হল শ্রীশ্রীবামদেবের গুরুদেব কৈলাশপতির সাধনস্থল, এককথায় শ্রীশ্রীবামের গুরুবাড়ী। শোনা যায় শ্রীশ্রীবাম ঐ গুরুস্থানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

ডাবুক

কখনো একবেলার বেশি থাকতেন না এবং নিজের এঁটো পাত নিজেই পরিষ্কার করতেন। মহামানবেরা এই ভাবেই আমাদের শিক্ষা দিয়ে যান। এই কারণেই মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

বশিষ্ঠদেবের কাছে এবং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সান্দিপনী মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন জগতের বুকে গুরুপরম্পরার দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

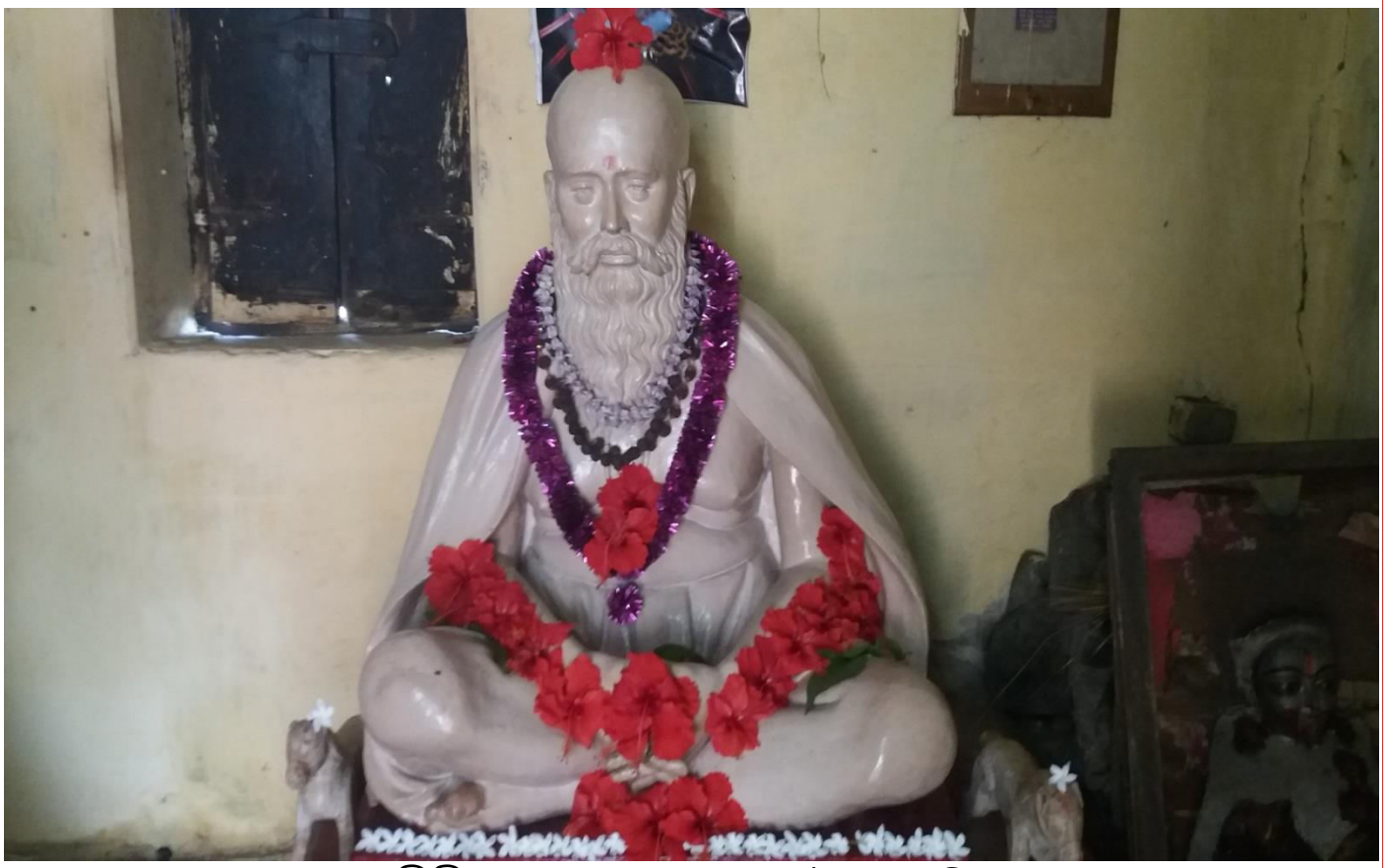

শ্রীশ্রী বামদেবের গুরুদেব কৈলাশপতি

আবার একটু বড় রাস্তায় এসে একটা মোড়ের মত জায়গায় আমাদের অটো থামল। চালক বললেন এই হল ডাবুকেশ্বর শিব মন্দির। বেশ বড় জায়গা জুড়ে এই মন্দির।

ডাবুকেশ্বর শিব

প্রাচীন নির্মাণশৈলীর বড় প্রবেশদ্বার পেরিয়ে আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। বাঁধানো প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। বেশ সাজানো গোছানো চত্বর। দুইদিকে টগর ফুলের, কলকে ফুলের গাছ। তারা মন্দিরের শৈলীতে নির্মিত এই মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখলাম একজন কম বয়সী পুরোহিত বসে আছেন। সবুজ গ্রানাইটের মোটা বেদী। তার চারপাশ ঘিরে শিউলি ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো। ঐ বেদীর অনেকটা নিচে ডাবুকেশ্বর শিবলিঙ্গ। উপরে সর্প আচ্ছাদন। আমরা ডাবুকেশ্বর শিবলিঙ্গকে পুজো করলাম মনের আনন্দে। পুরোহিত চরণামৃত দিলেন আমাদের। মন্দির থেকে নেমেই ঠিক ডানদিকে অনেকগুলি ঘর পরপর। একটিতে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। পরের ঘরটিতে শ্রীশ্রীবামদেবের গুরুদেব

কৈলাশপতির মূর্তি বিরাজমান। বাইরে ভোগের প্রস্তুতি চলছে। আমরা সেই মহাপ্রাণকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। অটো চালককে বলা হল বীরচন্দ্রপুরে আমাদের নামিয়ে দিতে।

এরপর আমাদের অটো বীরচন্দ্রপুরের দিকে এগোলো। বাঁকারায়, জগন্নাথ মন্দির হয়ে নিতাই বাড়ী ও বকরাক্ষস ও পঞ্চপান্ডবের স্থান দর্শন করে আমরা অটো ছেড়ে দিলাম ভাড়া মিটিয়ে। বিস্তারিত বিবরণ এই তারাপীঠের রচনার অন্তর্গত নয় বলে আর দিলাম না।

তবে নিতাই বাড়ীর থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে দ্বিতীয়বার যাবার ইচ্ছা আর নেই। আমাদের দাদারও ওদের সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু ইস্কন বীরচন্দ্রপুরে সেদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। ইস্কনের মতবাদ বা ওদের গ্রন্থগুলির সাথে শরণাগত সম্প্রদায় একমত নয়। কিন্তু ওদের হরিনাম প্রচার ও ভগবৎসেবা অতুলনীয়। আমি বীরচন্দ্রপুর, কলকাতা, দিল্লী, পুরী, মুম্বাই, দ্বারকা, বৃন্দাবন, বারাণসী, তিরুপতি~~ ইস্কনের সব শাখা গুলিতেই অপূর্ব পরিবেশ পেয়েছি।

যাই হোক, আমরা বীরচন্দ্রপুরের মূল রাস্তায় একটি ফাঁকা এম্বাসেডর পেয়ে গেলাম যেটি শহরের দিকে যাচ্ছিল। মা তারার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা রওনা দিলাম। আপাততঃ কিছুদিন বীরভূমের বাড়ীতে থেকে তারপর কলকাতা রওনা

দেব। কিন্তু সাথে নিয়ে চললাম তারাপীঠের অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

একুশ

“সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।।”

ফিরে আসি ফ্ল্যাশব্যাক থেকে বর্তমানে। এবার অর্থাৎ ২০১৭ তে পুজোয় আমাদের মহারাষ্ট্র যাওয়ার কথা। সেই মতো শ্রীশ্রীবাবার অনুমতি চেয়েছি। শ্রীশ্রীবাবা শেষদিন বলেছিলেন, দেখ মায়ের কি ইচ্ছা। হঠাৎ অনিবার্য কারণে আমাদের মহারাষ্ট্র ট্যুর বাতিল করতে হয়। তো পুজোয় তাই খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে তারাপীঠ আসা।
এবারও বেনফিসের গেস্ট হাউস রক্তজবায় উঠেছি আমরা। ২০১৫র মতো এবার আর ভুল হয়নি। পৌঁছেই বিকেলে পাঁচ রকম ফল, শাড়ী আর বাতাসা নিয়ে মুন্ডমালিনী তলায় মা তারাকে পুজো দিতে গিয়েছি। এবারের পুজোয় আকাশের মুখ ভার হয়েছিল। প্রবলবৃষ্টিতে পুজোয় প্রতিমাদর্শনও মাটি হয়েছে। কিন্তু আমরা তো এসেছি চিন্ময়ী মাকে দর্শন করতে।

এবার আর বাইরে কোথাও যাওয়ার নেই। শুধু তারা মন্দিরে আর পাদপদ্মে পুজো দেওয়া। তাই পুজোর ক’টা দিন অখন্ড অবসর।

দাদার সাথে যেখানেই যাই না কেন, একটা জিনিস দেখেছি, দাদা ছুটে বেড়ানোর থেকে জপধ্যানে সময় অতিবাহিত করতেই বেশি পচ্ছন্দ করেন। তো এবার আমার মাকেও বললাম সেকথা। মাও সানন্দে রাজী।

মহাষ্টমীর সন্ধ্যেবেলায় আমরা তারা মন্দিরের নাট মন্দিরের বারান্দায় কোণের দিকে আসন পেতে বসলাম। সামনেই মায়ের গর্ভগৃহ। যদিও মায়ের প্রতিমার সামনে বিরাট জটলা এবং আসনে বসে মা দৃশ্যমান নন, কিন্তু তবুও ঐ জনকোলাহলেও মনকে খুব সহজেই জনবিচ্ছিন্ন করা গেল। আমাদের খুব কাছেই চন্দ্রচূড় শিব মন্দির। আর নাটমন্দিরে মা তারার উগ্রতারা রূপের একটি চিত্রপট বাঁধানো রয়েছে। যেন মা ঐ চিত্রের ভিতর দিয়েই তাঁর সকল আগত ভক্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন এবং যাঁরা প্রকৃতই তাঁকে জানতে, তাঁকে পেতে যায়, তাদের কৃপা করে দিকনির্দেশও করে দেন। কাঁসর ঘন্টা ধ্বনিতে মায়ের মন্দিরে এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে সকলের সমস্ত কর্মের হিসেব যেন রাখছেন। আর তার ফলও প্রদান করছেন। ঐ “কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে করো অধোগামী”র মতো।

বাইশ

শ্রীশ্রীবিপুল বাবাকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আচ্ছা বাবা, এই যে সকলে বলে, ভোর বেলা মা তারার মন্দিরে শিলামূর্তি দর্শন করে

এলাম, তা এটা নিশ্চয়ই খুব মঙ্গলজনক?" উত্তরে তারা মায়ের কোলের ছেলে শ্রীশ্রীবিপুলবাবা যা বলেছিলেন, তা আগামীদিনে মহাপীঠ তারাপীঠ দর্শনে ইচ্ছুক সকল ভক্তের জেনে রাখা প্রয়োজন। এর উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলেছিলেন, "তোমরা কি কেউ নিজের মাকে অনাবৃত বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে চাও? নিশ্চয়ই নয়। জেনে রাখবে, ঐ অবস্থায় তারাশিলা দর্শন ঘোর অনুচিত কার্য, অকল্যাণকর।"

বেশ কয়েকজনকে দেখেছি, খুব গর্বের সঙ্গে বলতে, "আরে! ভোরবেলা মায়ের শিলামূর্তি দেখিসনি, তো কিছুই দেখিসনি।"
এবার আসি ঐ তারাশিলা প্রসঙ্গে। সত্যযুগে সতীদেবীর দেহ সুদর্শন চক্রে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেখানে যেখানে পতিত হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই প্রস্তরীভূত হয়ে সতীপীঠ রূপে খ্যাত হয়েছে। এখন তারাপীঠেও ঐরূপ মায়ের তৃতীয় নয়ন পতিত হয়ে প্রস্তরীভূত হয়। এই তারাশিলার উপর খোদাই করা আছে মায়ের চিরন্তনী স্নেহবৎসল রূপ।

সমুদ্রমন্থনের ফলে যে হলাহল গরল নির্গত হয়েছে বাসুকি নাগের মুখ থেকে তা গ্রহণ করবার সামর্থ্য কারোর না থাকায় সকল দেবদানব মিলিত ভাবে শ্রীবিষ্ণুর পরামর্শে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব সৃষ্টি রক্ষার্থে ঐ হলাহল ধারণ করেন। ঐ হলাহল যাতে মহাদেবের কন্ঠের নিচে না নামে তারজন্য মাতা পার্বতী কন্ঠেই তার গতিরোধ করেন। কিন্তু ঐ তীব্র দহন জ্বালা মহাদেবকে অস্থির করে তোলে। তখন পঞ্চাকাশে বিরাজিতা ত্রিলোকজননী মা তারা মহাদেবকে শিশুবৎ নিজক্রোড়ে ধারণপূর্বক নিজ স্তন্যদুগ্ধ পান করান। এবং নীলকন্ঠ মহাদেব হলাহলের ঐ সুতীব্র দহনজ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পান।

তারাপীঠের তারাশিলায় এই মা তারার মহাদেবকে স্তন্যপান করানোর চিত্রটিই অঙ্কিত আছে।

তাই আমরা কখনো ঐ পরমপবিত্র তারাশিলা দেখিওনি আর দেখতেও চাইনা। মঙ্গলারতি হয়ে যাবার পর নাটমন্দির তথা মন্দির চত্বর বেশ সুনসান হয়ে এসেছে। ভিড় আসতে আসতে পাতলা হয়ে আসছে। আমরাও ধরলাম ফিরতি পথ। তারা মন্দিরের রাস্তায় নীল তারা নামের একটি হোটেল কাম রেষ্ট্যুরেন্ট আছে। ওখানে বাঙালি, উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় সকল খাবারই বেশ ভালো বানায়। আমরা তিনটে ভেজ থালি নিলাম। সানন্দে রাতের আহার সম্পন্ন হল।

তেইশ

আচ্ছা, এখন তারাপীঠ বললেই চোখের সামনে কি চিত্র ভেসে ওঠে বলুন তো? দ্বীপান্বিতা কালীপুজো আর কৌশিকী অমাবস্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় আর সারা বছর ভর এখানে নিশ্চিন্তে “ম”কার সমৃদ্ধ দুটি বস্তু বিনাবাধায় পানভোজনের আনন্দ উপভোগ করা। দিন দিন তারাপীঠ ও সংলগ্ন অঞ্চলে পানশালা এবং পানীয় বিক্রয় কেন্দ্র যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হয়ত একমাত্র গোয়ার সঙ্গে তুলনীয়। তারাপীঠ তন্ত্রোক্ত সিদ্ধপীঠ নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই পরম পবিত্র তীর্থ যথেচ্ছাচারের স্থান নয়। বর্তমানে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পর তারাপীঠের রূপরেখা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। হয়ত বা আগামীদিনে আরও আধুনিকীকরণ হবে। এর ফলে

ঐ যত্রতত্র নেশা বা ঐধরনের কার্যকলাপ বা প্রকাশ্যে ঘৃণ্য / সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অনেক নিয়ন্ত্রণ হবে। কিন্তু এই আধুনিকীকরণের ফলে তারাপীঠের প্রাণ, তার ধমনী আস্তে আস্তে ধীর হয়ে যাচ্ছে। কৌশিকী অমাবস্যায় বা অন্যান্য তিথিতে যেভাবে মহাশ্মশানে ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে যজ্ঞ করা হচ্ছে সামান্য সিদ্ধাই শক্তির লোভে, যেভাবে মহাশ্মশানের গাছ কেটে হোটেল, ঘরবাড়ী তৈরী চলছে, তাতে অবিলম্বে রাশ টানা প্রয়োজন। যে মহাশ্মশানে একদা দিনের বেলাতেও প্রবেশ করতে গা ছমছম করত, গভীর রাতে শ্মশান বিভূতি প্রকট হত, মায়ের গণেরা আবির্ভূত হত, সেখানে দিনের বেলা তারস্বরে চটুল হিন্দিগান চলছে, রাত্রে হ্যালোজেনের আলোয় খিচুরীর লঙ্গরখানা হচ্ছে, অদ্ভূতদর্শন জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপনে প্রবেশ পথ দৃশ্যদূষণের কবলে পড়ছে। মানুষের স্বার্থে, ভক্তদের স্বার্থে এই ব্যাপারে সকলকে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে হবে।

এই মহাশ্মশান অতি বিরল। উত্তরবাহিনী নদী যে শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চলে তার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য অপরিসীম। বারাণসীতেও ঐরূপ গঙ্গা উত্তরবাহিনী। তাইতো মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে স্বয়ং মহাদেব সকল মৃতদেহের কানে তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে তাদের পৌঁছেদেন মহামুক্তির দ্বারপ্রান্তে।

শ্রীশ্রীবিপুলবাবা তাঁর “মহাপীঠ তারাপীঠ” গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে জগৎবাসীকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। এই মহাপবিত্র সতীপীঠ তথা মহাশ্মশানের পবিত্রতা যারা বিনষ্ট করতে চাইবে ,

যারা এই স্থানে কুকর্ম করবার অসৎউদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, অন্তিমে তাদের এরজন্য চরম মূল্য দিতে হবে। মা তারা তাদের উচিৎ শাস্তি প্রদান করবেন। মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রতিটি কর্মের হিসেব কিন্তু কৈবল্যদায়িনী কালী ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী তারা মায়ের কাছে আছে। তাই আমাদের অক্ষরে অক্ষরে "মহাপীঠ তারাপীঠ"য়ে বর্ণিত শ্রীশ্রীবাবার সেই সাবধানবাণী মেনে চলা উচিৎ।

চব্বিশ

মহাপীঠ তারাপীঠ। এই পুণ্যভূমির আকাশে বাতাসে কত না অসংখ্য সাধক সাধিকার চিৎ শক্তির অনুরণন ছড়িয়ে আছে। সৎ প্রচেষ্টা নিয়ে তাকে অনুভব করতে চাইলে, আজও সাধকদের সেই চিৎশক্তি কৃপা করে। শ্রীশ্রীবিপুল বাবা বলছিলেন যে, এখনো, এই ক্ষয়িষ্ণু বর্তমান যুগেও অসংখ্য সাধক তারাপীঠে সাধনা করে মা তারার কৃপা লাভে সমর্থ হবে, আপ্তকাম হবে।

আমরা আজ মহানবমীতে সারাদিন তারাপীঠে কাটিয়ে কাল রওনা দেব বাড়ীর উদ্দেশ্যে। আজ সকালে সকল উপকরণ (কারনবারি সহ) নিয়ে এসেছি বামা মিশনের শ্রীশ্রীবামদেবের পূজার উদ্দেশ্যে। ঢুকতে না ঢুকতেই চারপাঁচ জন লোক গর্ভগৃহের পিছনদিকের কলতলা ও রসুইঘর থেকে আমার মা কে ডাক দিল। মা এগিয়ে গেলে বলল, "মা কুত্থিকে আইসছেন? আমাদের খুশি করেন।" মা তো আকাশ থেকে

পড়ল। আমি “এখনো পুজোই হল না” বলে ধমক লাগিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এবার একটু বয়স্ক পুরোহিত মশায় রয়েছেন। উনি ধীরে ধীরে পুজোর যোগাড় সেরে পুজো শুরু করলেন। পুষ্পাঞ্জলী, আরতি হল। আমি একটু জপে বসবার চেষ্টা করলাম আসন পেতে।

সম্মুখেই শ্রীশ্রীবামদেবের অপরূপ মূর্তি। মাথায় রুপোর মুকুট পরিহিত। ডানদিকে মহাত্মা হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বামদিকে শ্রীশ্রীবামের প্রধান শিষ্য তারাক্ষ্যাপার আলোকচিত্র বাঁধানো রয়েছে। দুটি চিত্রই অত্যন্ত উজ্জ্বল।

চোখ বন্ধ করে জপ চলাকালীন হঠাৎ মনে হল, কেউ যেন আমায় দেখছে। অত্যন্ত প্রখর তাঁর দৃষ্টি। ঈষৎ দীর্ঘ কেশরাশি, চওড়া কপাল, দুই বাহু বেশ শক্তোপোক্ত। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে কৃপার পরশও ছিল। আর ঐ চোখ দুটো আমার পরিচিত।

বাইরে বেরিয়ে এসে সামনের খোলা অংশ থেকে প্রণাম জানালাম শ্রীশ্রীবামদেবের শ্রীচরণে। বাইরে নামফলকে লেখা রয়েছে,

“বামা মিশন
প্রতিষ্ঠাতা- তারানাথ ব্রহ্মচারী”।

সন্ধ্যেবেলা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমরা আর একপ্রস্থ তারা মন্দিরে এসেছি দর্শনাভিলাষে। তুমুল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। নাট মন্দিরের বারান্দা প্রায় ফাঁকা । আমরা যথারীতি বসেছি

আসন পেতে জপে। একজন বয়স্কমহিলা তার স্বামী ছেলে বৌ নিয়ে সদর্পে আমাদেরকে মাড়িয়ে দিয়ে নাট মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অথচ আশেপাশে প্রচুর জায়গা। যাই হোক, “সকলই তোমারই ইচ্ছা”।

আজ তারা মন্দির আরও ফাঁকা। জপ সেরে উঠতেই দেখি পাশেই এক ভদ্রলোক একটি বড় পিতলের হাঁড়ি নিয়ে এসেছেন, আরেকজন তার থেকে একটি হাতায় করে শালপাতায় একটু করে মায়ের শীতলী ভোগ পায়েস বিতরণ করছেন। আমাদেরও দিলেন সানন্দে।

আধভেজা অবস্থায় কোনমতে একটি অটো ধরে ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে । মওকা বুঝে সেও এইটুকু রাস্তা জনপ্রতি ২০ টাকা করে কামিয়ে নিল। হাঃহাঃ।

মায়ের কৃপার পরশে আমরা অভিভূত, সিঞ্চিত। মা তারা কৃপা করলে আবার আসব এই পুণ্যভূমিতে।

জয় জয় তারা জয় জয় বাম। শ্রীগুরু শরণম্।
জয় জয় শ্রীবিপুল বাবা। জয় শ্রীকৃষ্ণ ।